প্রাচীর

মীরা মজুমদার

নবযুগ সাহিত্য মন্দির

প্রকাশক :
শ্রীঅণিমা দেবী
নবযুগ সাহিত্য মন্দির
৩নং বেলিয়াঘাটা মেইন্ রোড্,
কলিকাতা-১০

আষাঢ় ১৩৬৮, ইং জুন্ ১৯৬১

মূল্য তিন টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীতুলসীচরণ বক্সী
ন্যাশনাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩৩ডি, মদন মিত্র লেন,
কলিকাতা-৬

আমার ভারতবর্ষকে—

প্রাচীর
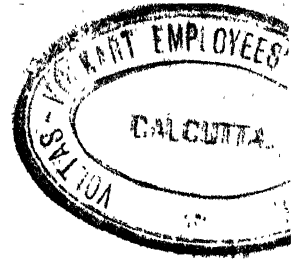
এক

'বিভা!'—কোমল, ভেজা ভেজা কণ্ঠ নিশিকান্তের।

'বিভা, ঠাণ্ডা লাগবে শোবে এস।'—

'না।'—জানালার গরাদে ধরে বাইরের অন্ধকারে দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে রইল বিভা।

বর্ষণমুখর রাত্রি। তীরের মত বৃষ্টির ছাট্ এসে বিঁধছে চোখে মুখে, ভিজিয়ে দিচ্ছে ওর বসনপ্রান্ত। বাইরে অন্ধরাত্রির উন্মত্ত ঝোড়ো বাতাসে অধীর হয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে মাথা-উঁচু-করা ঝাউয়ের সারি।

'কী ছেলেমানুষি করছো বিভা!'—বিভার কাঁধে একটা হাত রাখল নিশিকান্ত।

'ছেলেমানুষি যদি কিছু ক'রে থাকি তো সে আগে, আজ নয়।'—কাঁধের ওপর থেকে স্বামীর হাত সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল সে।

'বেশ, নয় তোমার কথাই মেনে নিলুম, কিন্তু যা' অসম্ভব······ লক্ষ্মীটি, এখনকার মত শোবে এস·······।'

'কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।'—রোষভরা কণ্ঠ বিভার।

'ছিঃ বিভা, তুমি শুধু নিজের দিকটাই দেখছ! মা, বাবা, এঁদের কথাটা একবার ভাবছোনা? সারাজীবন ওঁরা একটা ধারণা, একটা সমাজচেতনা নিয়ে কাটিয়ে এসেছেন, আজ এই বুড়ো-বয়সে হঠাৎ যদি তার মূলে আঘাত পড়ে, সইতে পারবেন কি?—তোমার জন্যে তো তাঁরা কম ছাড়েননি বিভা, এবাড়ীতে কোনো মেয়ে-বৌ কখনও যে-

স্বাধীনতা পায়নি, তোমায় তাঁরা তাই দিয়েছেন,—সে কথাটা ভেবে দেখো একবার। যাঁরা তোমার জন্যে অনেকখানি ত্যাগ করেছেন তাঁদের জন্যে তুমি কি একটু ত্যাগ করতে পারবেনা? আর—— তাঁরা যাই বলুন যাই করুন না কেন, তাঁরা যে তোমায় ভালোবাসেন এর মধ্যে তো কোনো মিথ্যে নেই! তাঁদের মান-সম্মান, তাঁদের মর্যাদা ধূলোয় লুটি'য়ে দি'তে তোমার কি এতটুকু বাজবে না বিভা?······'

'এ মানসম্মান এ মর্যাদা-বোধের জন্ম অ্যারিস্টোক্র্যাটিক ট্র্যাডিশন্ আর সঙ্কীর্ণ আত্মাভিমান থেকে, সেইজন্যেই একে ভেঙে দেয়া উচিত। একটা মজুরদের মীটিং অ্যাটেণ্ড্ করলেই নষ্ট হবে মানুষের মর্যাদা কি এতই ঠুন্‌কো?'

থাক্। ও নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই, জানে নিশিকান্ত। সহজ, স্বাভাবিক বুদ্ধিতে যা' বলে তা' বুঝবেনা বিভা। মানবেনা সমাজ-সংসারের অতি সাধারণ দাবী। একী অসম্ভব জেদ তার,—ভাবে নিশিকান্ত। বনেদী জমিদার বাড়ীর বৌ একলা যাবে পায়ে হেঁটে চাষী আর মজুরদের সঙ্গে মীটিং করতে? গালাগালি, মারামারি, মাতলামি—কী না হ'তে পারে সেখানে?—যাদের সঙ্গে, যাদের জন্যে ও যেতে চাইছে তারা নিজেরাইকি তামাসা বিদ্রূপ করবেনা ওর আড়ালে, ওকে নিয়েই? কিন্তু সে কথা বলেও লাভ নেই, জানে নিশিকান্ত। বই থেকে পড়া কতকগুলো বড় বড় কথা ওর ঠোঁটের ডগায়। বিশেষ করে আজকাল এটা বড় বেড়েছে।—না, ওদিক দিয়ে সুবিধে হবে না, বোঝে সে। অন্য দিক দিয়ে, ওর হৃদয়ে ঘা দিতে হবে।

'বিভা, তুমি যা' বলছ সবই সত্য'—নিশিকান্ত ব'লে চলে— 'কিন্তু আমি শুধু একটা কথা তোমায় বলি, এই যে জেদ ক'রে একটা কাজ করতে চাইছ, এর ফল কী হবে জানো? —বিচ্ছেদ।

—একটা সাজানো সংসার ভেঙে যাবে। বৃদ্ধ মা, বাবা কতখানি আঘাত পাবেন তোমার ব্যবহারে ভেবে দেখেছ? আর আমি?—আমার অবস্থা হবে ঝড়ে-ভাঙা নৌকোর মত! এত ভালোবাসা, এত স্নেহ, এই একটা সুন্দর সংসার—সব ধুলোয় লুটিয়ে যাবে।—আর তুমি?—তুমিই কি পারবে সে আঘাতের ধাক্কা সামলাতে? বিভা, তোমার মন আর কেউ না জানুক আমি তো জানি, হয়তো তোমার চাইতেও বেশী চিনি তোমাকে আমি······ বিভা, তোমার কাছে এই সামান্য ব্যাপারটার কি এতই মূল্য যে আমাদের এত প্রেম তার কাছে ধুলোর চেয়েও তুচ্ছ?—তবে সে কথা গোড়াতেই বলে দাওনি কেন, কেন একদিন ভালোবেসেছিলে ······'—নিশিকান্তর কণ্ঠ সজল হয়ে এল।

'তোমার কথাই থাক। এস।' একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে স্বামীর হাত ধরল বিভা।

দুই

'বাবা, আপনাকে আর এক কাপ্ চা দেব?'—

'হ্যাঁ মা, দাও।'—আয়েস করে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বললেন শশিকান্ত, বিভার শ্বশুর। শশিকান্ত বাবুর বয়েস ষাটের ওপর, ব্লাড্প্রেশারের রোগী, হার্ট্ দুর্বল ব'লে বেশী পরিশ্রম করেন না কিছুতে। ডাক্তারের বারণও বটে, আর ক্ষমতাও নেই। এই সকালবেলার সময়টা তিনি থাকেন তাঁর লাইব্রেরী ঘরে। বই পড়েন, সাধারণতঃ ধর্মসম্বন্ধীয় বই। কিন্তু এই গ্রন্থাগারটির সংগ্রহ কম নয়, কারণ বই-কেনার ব্যাপারে তাঁর কোনোদিকে বিশেষ পক্ষপাত নেই। ধর্ম, দর্শন,—প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দুইই,—সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্যনীতি—এমন কি রন্ধননীতি পর্যন্ত কোনো

বিষয়েরই ইংরেজী-বাংলা বই বাদ যায় না। এ-ছাড়া নানারকম পত্রিকা তো আসেই। বাইরে থেকে কোনো সম্মানিত অতিথি এলে শশিকান্ত সগর্বে এই লাইব্রেরী ঘুরে দেখান, আর যে-কোনো অতিথি স্বীকার করতে বাধ্য হন যে হ্যাঁ, এরকম একটা প্রাইভেট্ লাইব্রেরী কোনো রাজারাজড়ার বাড়ীতেও আছে কিনা সন্দেহ। পুত্রবধূকে তিনি এই লাইব্রেরী ঘরে স্বচ্ছন্দ-বিহারের অনুমতি দিয়েছেন, অন্য বিষয়ে গোঁড়ামি থাকলেও বইপড়ার বিষয়ে কোনো গোঁড়ামি তাঁর নেই। বিশেষ ক'রে, লেখাপড়ায় বিভার উৎসাহ দেখে তিনি বহুদিন আগেই সরকার মশাইকে ব'লে দিয়েছিলেন যে বধূমাতার নির্দেশ-মত সব বইই যেন কলকাতা থেকে আনিয়ে দেওয়া হয়। অনেক সন্তান মরার পর অনেক বয়েসে অনেক পূজো মানত ক'রে নিশিকান্তকে পেয়েছেন তিনি, তারই বধূ বিভা। তাই বধূর প্রতি তাঁর স্নেহের সীমা নেই।

হাল্কা-নীল আমেরিকান্ কাপে ক'রে এক কাপ চা এনে রাখল বিভা, টেবিলের ওপর।

'বস মা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ঐ তোমাদের এক স্বভাব—'

বস্‌তে হল বিভাকে। রসিয়ে রসিয়ে চুমুক দিয়ে গরম চা টুকু শেষ করলেন শশিকান্ত। তারপর স্মিত হেসে বললেন—'কী মা, আজকের খবর কা? শরীর ভালো আছে তো? কাল বিকেলে নাকি মাথা ধরেছিল?—গিন্নী বলছিলেন—'

'ও কিছুনা, বাবা। বেশ ভালো আছি।····· একটা কথা বলব বাবা—?'

'বল, বল, কী কথা—?'

'এই উষাদের বাড়ী একটু যাব দুপুরবেলা?'

'তোমার শাশুড়ী সঙ্গে যাবেন তো? নিশাকে দিয়ে কোচোয়ান্‌কে বলে রেখো কোন্ সময়ে······'

'গাড়ী কেন বাবা, এইতো মোড়েই,—দশবারোখানা বাড়ী পরেই,—এটুকু খুব হেঁটে যাব। আর মা দুপুরবেলা একটু বিশ্রাম করেন, ওঁকে আর কী করতে টানবো বাবা?'

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন শশিকান্ত—'এই পাশের বাড়ী হলেও হেঁটে যাওয়া চলবে না মা, তাতে আমাদের মর্যাদার হানি হবে। এ আমলে তো মা তোমরা ছাদে ওঠো, এর তার বাড়ী যাও, ঘোমটাও দাও এই কপাল পর্যন্ত। কিন্তু আমার মায়ের আমলে .... গোঁসাইঠাকরুণ প্রায়ই বলতেন বউ বটে রায়বাড়ীর। আকাশ কেমন তা' কোনোদিন চেয়ে দেখেনি, গলায় উঁচু কথাটি কেউ শোনেনি কখনো। বন্ধপাল্কী ছাড়া যায়না কোথাও, একেবারে সেই ভিতরবাড়ী গিয়ে নামে, নিজের বাড়ীর ফটকের সামনে নামিয়ে দিলেও বাড়ী চিনতে পারবেনা। কী করে পারবে?—কোনোদিন তো বা'র-মহল দেখেনি!'

শুনে বুকের ভিতর কেমন করে ওঠে বিভার। আকাশ—ওই নীল আকাশ—ওই যেখানে অসীম মুক্তির একটুখানি আভাস—ওটুকুও না দেখে মানুষ বাঁচবে কেমন করে?—বউ, মেয়েমানুষ!—সে তো আর মানুষ নয়!—তবে মানুষের যা' প্রয়োজন তার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কী? মেয়েমানুষ তো পুরুষের হাতে তৈরী একটা যন্ত্র, পুরুষের ইচ্ছায় পরিচালিত, পুরুষেরই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে। সে তো পুরুষের হাতে তারের সুতোয় খেলানো নাচের পুতুল, সেতো আর মনপ্রাণওলা একটা জীবন নয় যে তার একটা নিজস্ব সত্তা বলে কিছু থাকবে!

'কিন্তু বাবা এটা কি ভালো——'

'নিশ্চয় ভালো মা, একশোবার। শাস্ত্রে বলেছে দেখোনা লজ্জা নারীণাং ভূষণম্। আগেকার মেয়েদের লজ্জা ছিল বটে দেখবার মতন। তুমি দেখনি মা তোমার শাশুড়ীকে অল্পবয়েসে। আমার মায়ের কড়া শাসন ছিল, ঘোমটা বুকের ওপর উঠবেনা। মাঝে মাঝে

তোমার শাশুড়া হোঁচট্ খেতেন দেখেছি, কলতলায়তো কতবার পড়ে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই—' একটু সগর্ব আত্মতৃপ্তির হাসি হাসলেন শশিকান্ত—'আমার মা বলতেন বউমানুষের মুখ লোকে দেখবে কি? কথা বলবে আস্তে, হাঁটবে আস্তে, ঘাড় হেঁট করে, না-তো কি ঝলাং ঝলাং করে আকাশপানে চেয়ে হাঁটবে, তক্কো করবে পুরুষমানুষের সঙ্গে?'

এরপর আর কী বলবে বিভা!—এদেরকে কোনো কিছু বোঝানোর চেয়ে জল দিয়ে পাথর কাটা বরং সহজ।

'তাহলে বাবা গাড়ীতেই যাব আজ দুপুর বেলা—'

'কা'কে নিয়ে যাবে সঙ্গে?'

'একলাই—'

'না মা একলা নয়; সেটা ভালো দেখাবেনা। রায়বাড়ীর বউ একলা যাবে গাড়ীতে ক'রে, সেকি হতে পারে?—তার চেয়ে, আমি বলিকি, উষাকেই কেন আনিয়ে নাওনা গাড়ী পাঠিয়ে? আরও যা'কে যা'কে দরকার—'

'উষা অনেকবার এসেছে বাবা এবাড়ী, বলেছে ওদের বাড়ী না গেলে সে আর আসবেনা। বলে তুমি কী বৌদি?—এযুগে মেয়েরা কত কাজ করছে কত দেশে, তুমিতো বই পড় এত, জান না কিছু?—এইটুকু আসতে পারনা একলা?'

'বলেছে বুঝি?—তবে ও-মেয়ের সঙ্গে আর না মেশাই ভালো। ওদেরতো সব বুঝছ মা আমাদের মত বনেদী ঘর নয়! শুনেছি ড্যাংডাংগিয়ে বেড়ায় মেয়েগুলো মাঠে ঘাটে···। এসব হচ্ছে মেম-সাহেবী কাণ্ড! তা সে যাই হোক, আমাদের দেখবার দরকার নেই। অন্য দেশের লোক যদি গরু খায়তো আমরাও খাব? অসভ্য বুনোরা যদি কাঁচা মাংস খায়তো আমাদেরও খেতে হবে?—ধর্ম আমাদের দেশ ছাড়া আর কোথায় আছে মা?—এখানে মেয়েরা

সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, সংসারকে ধরে রাখে। কথায় বলে নারী আর ধরিত্রী এরা হল সর্বংসহা। যত কষ্ট, যত দুঃখ, যত অত্যাচার আসুক, বুক ফাটবে তবু মুখ ফুটবে না! সেইতো আদর্শ মেয়ে মা! আহা, আজকাল আর সেরকম মেয়ে ক'টাই বা দেখা যায়! দেখেছি—আমার মাকে। বাবা ছিলেন রাগী মানুষ, তাঁর ভয়ে প্রজারা বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেত। তার ওপর এটা সেটা নেশাও ছিল তাঁর।—কাজেই মাঝে মাঝেই বাবা মা'কে প্রহার করতেন রাত্রি-বেলায়—কোনোদিন সকালে উঠে দেখতাম মায়ের মাথা ফেটে গেছে, কোনোদিন দেখতাম মায়ের মুখে হাতে পায়ে কালশিটের দাগ…। কিন্তু কোনোদিন টুঁ শব্দটি শুনিনি তাঁর মুখে। নালিশ করতেন না কারো কাছে, বাবাকে ভক্তি করতেন দেবতার মত। রোজ ভোর রাতে উঠে বাবার পা-ধোয়া জল খেয়ে তারপর কোনো কাজ করতেন। আর তাঁর মৃত্যুর কথা যখন ভাবি'—বলতে বলতে ভাবোদ্বেল হয়ে উঠ্‌ল তাঁর মুখমণ্ডল।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে তিনি আবার বলতে লাগলেন—'মা তখন শয্যায় শুয়ে, নানা রকম অসুখ, কিন্তু মায়ের জিদ ছিল বুড়ো কবরেজ ছাড়া আর কাউকে দেখাবেন না। বাবাও পছন্দ করতেন না পুরুষ-ডাক্তার এনে মেয়েছেলেকে দেখানো। তা' মা এমনি পড়ে আছেন,—একদিন সন্ধ্যেবেলা বাবা নেশা করে এলেন বা'রবাড়ী থেকে, এসেই মারতে লাগলেন লাথি - মার বুকে, পেটে। আমি বাধা দিতে গেলে বাবা রক্ত-চক্ষু করে চাইলেন, মা ইসারায় আমাকে নিষেধ করলেন। এতে বাবার যেন একটু চেতনা হ'ল—তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। মা'র তখন হয়ে এসেছে, মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে, অস্ফুটে আমাকে বললেন বাবার খড়ম জোড়াটা এনে দিতে। তারপর সেই খড়ম বুকের ওপর ধরে ইষ্টমন্ত্র জপতে জপতে—'

'ওঃ সমস্ত পুরুষজাতটাকে যদি জীবন্ত দগ্ধ করা যেত!'—মনে

মনে বললে বিভা—'তাতেও যুগ যুগ ধরে এই সঞ্চিত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়া হ'তনা!' আর কোনো কথা না বলে বিভা উঠে যাচ্ছিল,—শশিকান্ত ডাকলেন। মনে মনে তিনি বধূকে একটু ভয়ই করেন। কারণ বিভা যে জেদী মেয়ে, সে-আমলের কড়াকড়ি অটুট রাখতে গেলে দড়ি যে ছিঁড়ে যাবে এ জানতে তাঁর আর বাকী নেই। বিভাকে অনেকখানি স্বাধীনতাই তিনি দিয়েছেন, যে স্বাধীনতা ঘরের বউকে দেয়া যায় এ তিনি কোনোদিন কল্পনাও করতে পারতেন না নিশিকান্তের বিয়ের আগে। কিন্তু ছেলের বিয়ের পর একটু একটু ক'রে অনেকই ছাড়তে হয়েছে তাঁকে, এই ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে স্ত্রী কিরণময়ীর প্রভাব ছিল। আর নিশিকান্তেরও যে তাতে সমর্থন ছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। শশিকান্ত মনে মনে সেকালের ভক্ত হলেও খুব একটা জেদী প্রকৃতি তাঁর নয়। তাই কালের হাওয়া অনুযায়ী তিনি খানিকটা এগিয়েছেন। কিন্তু তা'হলেও তিনি মনে করেন যে সবকিছুরই একটা সীমা আছে, সে সীমা ছাড়াতে গেলে সংঘাত অনিবার্য্য।

'দেখ মা, উষাদের বাড়ী যাবার ইচ্ছে যখন হয়েছে তোমার, তখন যেও আজ। তবে গাড়ী করে যেও, আর বিন্দু কি পরীকে সঙ্গে নিও। কেমন মা, এই বেশ?'

বিভা চুপ করে রইল, উত্তর দিতে তার প্রবৃত্তি হলনা।

*   *   *   *

তিন

আজকের সকালটি কেমন মেঘলা-মেদুলা, ছায়া ছন্না, ঠাণ্ডা। ঝির্ ঝির্ করে হাওয়া বইছে,—বাগানের পাম্‌গুলোতে সর্‌সর্ শব্দ তুলে, পাতাবাহারের মাথা থেকে ঝরে পড়ছে রঙীন পাতার রাশি—গোলাপী আর ভায়োলেট্‌। মাটিটা ভিজে-ভিজে, কাল রাতে এক পশ্‌লা বৃষ্টি হয়ে গেছে। স্নিগ্ধ, নরম মাটির 'পরে বিছানো রঙীন পাতার রাশির দিকে চেয়ে শঙ্কর বললে—'সেই মীটিংটাতে গিয়েছিলে বৌদি?' বিভা চুপ করে রইল। 'আমি জানতুম'—বল্‌লে শঙ্কর—'এবাড়ীর পাঁচিল বড় শক্ত, তুমি ভাঙ্‌তে পারবে না। তুমি কেন, কোনো বাঙ্গালী মেয়েই পারবে কিনা সন্দেহ! মামা-বাবুকে আমার জানতে বাকী নেই। তুমিতো এসেছ আর কদিন হল, খুব জোর বছর ছুই হবে। আর এবাড়ীকে আমি জানি সেই ছেলেবেলা থেকে। নীতা তো ওই ভয়েই আসতে চায়না এ বাড়ী। বলে আমি একদিন থাকলে মরে যাব ওখানে! অথচ নিশিদাকে খুব ভালোবাসে, বলে শুধু নিশিদার বাড়ী হলে যেতুম, কিন্তু মামা-বাবু বেঁচে থাকতে—'

'ছিঃ শঙ্কর,—আমার সামনে তুমি এধরণের কথা বোলোনা। তিনি তোমাদের ভালোবাসেন এবং আমাকেও বাসেন—আন্তরিক। সে 'ভালবাসার মধ্যে কোনো গলদ নেই। আমার যখন 'ব্রি'-কোলাই হয়েছিল, এবাড়ীর সবাই যা' করত তাতো করতই,—উনি বুড়ো বয়সে ভাঙা শরীর নিয়ে কী দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছেন, ওঁর কাছেই শুনেছি। দিনের পর দিন ভাত মুখে তুলতে পারেন নি, রাতের পর রাত জেগেছেন…'

'সেকথা মিথ্যে তা তো আমি বলিনি বৌদি! কিন্তু তুমি নিজে অনেক বই পড়েছ,—সেদিন তোমাদের লাইব্রেরীতে দেখলুম 'Struggle for China' বলে একটা বই রয়েছে,—ওটা পড়লে

দেখতে পাবে একজায়গায় মাদাম্ সান্ বলছেন—এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে অনেক মহাপণ্ডিত দেশপ্রেমিক কর্মী আছেন যাঁদের বিবিধ দুর্লভ গুণ থাকা সত্ত্বেও মেয়েদের ব্যাপারে তাঁদের সেই মধ্যযুগীয় ধারণাই রয়ে গেছে। লেনিন্‌ও বলেছেন নারীর ওপর পুরুষের যে অধিকারবোধ তার মূল অতি গভীরে, আর সেই মূলকে উৎপাটন করতে হবে নির্দয়ভাবে। কিন্তু অতদূর তো অনেক পরের কথা,—তুমি একটা সামান্য মীটিংএও যদি যেতে না পারো…'

'মীটিংএ গেলেই এমন কি অষ্টার্থ সিদ্ধি হ'ত শঙ্কর? আর তোমায় জিজ্ঞেস করি,—তোমার কলেজের মেয়েরা কি যায় সেখানে?'

'সে কথা অবান্তর বৌদি।'—অল্প একটু হাসল শঙ্কর। এই হাসিটা সইতে পারে না বিভা। কেমন বিষণ্ণ ম্লান অথচ কঠিন একটা ভাব আছে এর মধ্যে,—একটা গভীর দৃঢ়তা এবং ব্যথাবোধ এমনভাবে মিশে থাকে এর মধ্যে যে ভাবপ্রবণ হৃদয়কে তা' আঘাত না করেই পারে না।

'আমার কলেজের মেয়েরা মীটিংএ যায় কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। আজকালকার যে কোনো কলেজের মেয়ের চেয়ে তোমার general knowledge কিছু কম নয়। ঐ লাইব্রেরী তো তোমারই একচেটে সম্পত্তি বলতে গেলে। আজকালকার তথা-কথিত শিক্ষিত মেয়েরা কী করে?—পড়ার বই মুখস্থ, ট্র্যাশ্ নভেল্ পড়া, হৈচৈ করে দিন কাটানো, আর শেষ পর্য্যন্ত একটা শাঁসালো পাত্র, অভাবে একটা 'রেস্‌পেক্টেব্‌ল্' চাকরী জোগাড়! কী আছে তাদের? দুটো কথা বললেই বোঝা যায় একেবারে ফাঁপা—ফোঁপরা, ভেতরে কিচ্ছু নেই! না আছে তাদের চিন্তা করার ক্ষমতা, না বুদ্ধি, না হৃদয়। এমন কি দেশ বলে একটা অনুভূতি পর্য্যন্ত তাদের নেই,—যা কিনা একটা গণ্ডমূর্খেরও থাকা উচিত।'

'আর তোমাদের পুরুষদের আছে তো খুব?'

'না,—এদেশে তাও নেই! আমার ওপর রাগ করছ কেন বৌদি,—মেয়েদের নিন্দে করাই আমার উদ্দেশ্য নয়, নারী পুরুষ সবাই আমার কাছে সমান। কারো প্রতি আমার পক্ষপাত নেই।'

'কিন্তু একটা কথা, শঙ্কর, পুরুষদের পক্ষে দেশকে ভালোবাসা অনেক সহজ মেয়েদের চাইতে। সমস্ত দেশের সমাজ-ব্যবস্থা পুরুষের হাতে, পুরুষের সুখের জন্যে তৈরী। মেয়েদের জন্যে কোথাও এক কণা স্থান নেই। ব্রিটিশরা এদেশে না এলে মেয়েদের অবস্থা কী হ'ত?—সেই মোগল হারেমের অবস্থা থাকৃত। তাই সাধারণভাবে মেয়েদের দিক্ থেকে বিচার করলে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোনো মূল্যই নেই। পরাধীন ভারতে মেয়েরা পুরুষের ক্রীতদাসী ছিল—আজও তাই আছে। বাইরে থেকে একটুখানি ভোল বদলেছে, কিন্তু ভিতরে সেই মেরুদণ্ডহীন দাসত্ব! কার জন্যে আমরা মরতে যাব, শঙ্কর? এই যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র কুলিমজুরের কথা বলছ, এরাও মেয়েদের ওপর কম অত্যাচার করে না। নারী আর পুরুষের মধ্যে যে নির্যাতিত আর নির্যাতকের সম্পর্ক তা' ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ নির্বিশেষে এক। তোমাদের তথাকথিত সাম্যবাদী সমাজ-সেবকদের কথাও আমার জানতে বাকী নেই। আর, যেসব নেত্রীবৃন্দ গরম গরম বক্তৃতা দেন সভা সমিতিতে নারী-জাগরণ আর নারীর অধিকার সম্বন্ধে, আধুনিক ঢঙে শাড়ী প'রে,—অত্যন্ত লাইট্ কাজ যাতে তাঁদের কাল্‌চার্‌এর মুখোস বজায় থাকে,—সেছাড়া আর কোনো কঠিন ফীল্ড্‌ওয়ার্ক তাঁরা জীবনে করেন নি, করবার কথা ভাবতেও পারেন না! আর যে মেয়ে এদেশে কোদাল চালাবে কি গাঁইতি দিয়ে পাথর তুলবে—যে কাজের মধ্যে মানুষের সত্যিকার অধিকার জন্মায়—তাকে মূল্য দেবেনা এসমাজ কোনোদিন। নারীকে মানুষের মর্যাদা ভারতবর্ষ দেয়নি কোনোদিন, কোনোদিন পারবেওনা দিতে। যে মনুসংহিতাকে ভিত্তি করে আমাদের হিন্দু

সমাজের আচার-বিচার—হিন্দু আইন—গড়ে উঠেছে, তার প্রতি ছত্রে দেখ নারীকে বঞ্চিত করবার, তাকে লুণ্ঠিত, লাঞ্ছিত, সর্ব্বস্বহারা করবার প্ল্যান্ কী নিপুণভাবে তৈরী করা হয়েছে! নারীর কোনো জাতি গোত্র দেশ নেই শঙ্কর, সে শুধু অত্যাচারিত, এই তার পরিচয়।'

'তোমার সমস্ত কথাই আমি মেনে নিচ্ছি বৌদি। আর এও বলতে চাই যে তোমরা মেয়েরা যদি আজ নিজেদের যথার্থ অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে চাও তবে জোর করে এদেশের মাটি এবং মানুষের ওপর তোমাদের চড়াও হতে হবে। নিজেদের অধিকার কেড়ে নিতে হবে প্রতারকদের হাত থেকে! দেশকে আমার বললেই সে আমার, যদি বলি আমার নয় তবে আমি মূর্খের মতো দেশের ওপর আমার দাবী ছেড়ে দিই। আমার ওপর যেমন তার দাবী আছে তেমনি তার ওপরেও আছে আমার দাবী। তার সমাজ আমাকে বহিষ্কৃত করলেও আমি তো তার বাইরে নই! মা যদি সন্তানকে ত্যাগ করেন তবু সন্তান যে তাঁরই আত্মজ এ সত্য কি কোনোমতেই মুছে ফেলা যায়? ভারতবর্ষকে যদি আমি ভালোবেসে থাকি, তবে সে কখনো ব্যর্থ হতে পারে না বৌদি। জীবনে না হোক মরণে সে একদিন আমাকে বুঝবেই বুঝবে—'

শঙ্করের কণ্ঠে গভীর বিষাদের আভাস পেল বিভা।

শঙ্কর থামতেই একটা বিরাট স্তব্ধতায় ছেয়ে গেল চারিদিক। ক্ষণকালের জন্যে বিভার মনে হল গাছে গাছে বাতাসের কম্পন, ফুলের দোল খাওয়া, পাখীর ডাক, যা কিছু শব্দ বা গতি আছে বিশ্বসংসারে সব থেমে গেছে, মনে হল সমস্ত আকাশ বাতাস স্থির হয়ে এতক্ষণ শুনছিল শঙ্করের কথা...

'ওমা, বৌদিমণি তুমি এখানে! দাদাবাবু তোমার খোঁজ করছিলেন......' পরীর কথায় দুজনের চমক ভাঙল।

পরীর বয়েস অল্প, বিভার খাস পেয়ারের দাসী। দাদাবাবু

এবং বৌদিদিমণির মধ্যে সেই প্রধান যোগসূত্রের কাজ করে এ বাড়ীতে। শুধু তাই নয়, এ বাড়ীতে যারা বাইরে থেকে আসে, বিশেষ করে অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়ে-বউ, তাদের সবারই প্রীতিভাজন সে। এটা সেটা ফাইফরমাস, দরকার হলে বাড়ীর গুরুজনদের লুকিয়েও, হামেশাই সে খাটে। বখ্‌শিশও পায় কিছু কিছু।

'নিশিদা কোথায়, পরী?'—শঙ্কর জিজ্ঞেস করলে।

'ঐতো নিজের বসবার ঘরে।'

'আচ্ছা, আমরা যাচ্ছি, তুই যা'—বললে বিভা। পরী চলে গেল। ওরা দুজনে গিয়ে উঠল দোতালার ঘরে, যে ঘরটা নিশিকান্তর একেবারে নিজস্ব। ঢুকতেই নিশিকান্ত সহাস্যে বললে—'কখন এলে শঙ্কর? আমি বাইরে ছিলাম, তোমাকে দেখতে পাইনি।'

'এইতো আধঘণ্টাও হয়নি বোধ হয়। বৌদির সঙ্গে বাগানে বেড়াচ্ছিলুম।'

'সে জানি। দেওর-ভাজে যে বন্ধুত্ব!—আমি বেচারী কোণঠাসা হয়ে গেছি, আমাকে তো তোমরা তোমাদের আলোচনা থেকে একেবারে বাদই দাও...'

'তাই বইকি!'—শঙ্কর প্রতিবাদ করে—'তুমিই আমাদেরকে ঠেলে রেখেছ ছেলেমানুষ ব'লে। আমাদেরকে বন্ধুর মর্যাদা তো তুমি দাওনা দাদা।'

'সর্বনাশ! কে বলেছে?—আমি তোমাদেরকে বন্ধুর অনেক ওপরে স্থান দিই। আমি নিতান্তই মাটির পৃথিবীর মানুষ ভাই, তোমরা যে ভাবের স্বর্গলোকে বাস কর--তার নাগাল আমি পাই কী ক'রে?'

'তাই বুঝি? মাটির পৃথিবীর সঙ্গে যদি কারো কারবার থাকে এখানে তো সে আমার। কুলি-মজুর-চাষা এরা আমার রাত্রিদিনের

সাথী। তোমাদের মত পৈতৃক সম্পত্তির ওপর বসে বসে বিলাস করিনে দাদা। এই মহল আর এই পাঁচিলের বাইরে যে জলে-ভেজা রোদে-পোড়া জগৎটা আছে তাকে আমি দেখতে পাই। দুটো নাইট্ স্কুল খুলে সখের দেশসেবা আমরা করিনে, স্বাধীনতাদিবসে ঢাক-ঢোল সানাই বাজিয়ে সভাসমিতির উদ্বোধন, যখন তখন এর তার জন্মোৎসব পালন, আর গবর্ণমেণ্টের প্রোপাগ্যাণ্ডা করার চাইতে দরকারী কাজ আমাদের আছে।'

'জানি'—হাসল নিশিকান্ত—'তোমাদের কাজ হল কথায় কথায় ষ্ট্রাইক্ বাধানো, কলেজে ইউনিভার্সিটিতে ময়দানে নিপীড়িত-নির্যাতিতদের সম্বন্ধে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেয়া, আর ছেঁড়া কাপড়ে—নকল গরীব সেজে লোকের সিম্প্যাথি কিনে ইলেক্‌শন্ জেতার চেষ্টা করা!'

'অনেকের সম্বন্ধেই তোমার কথাটা সত্য হলেও সকলের সম্বন্ধে নয়। তবে সমস্ত জাতটারই নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে একথা ঠিক, রাইটিস্ট্, লেফটিস্ট্ কেউ বাদ নয়। আমাদের কম্যুনিস্ট্‌রা চিরদিনই কতকটা দিগ্‌ভ্রান্তের মত,—আর আজ কম্‌প্রোমাইজ্ এবং অ্যাড্‌জাষ্ট্‌মেণ্ট করতে করতে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে তা'রা যে কোনো সুবিধাবাদী, দুর্বল বুর্জোয়া পার্টির সঙ্গে তাদের বিশেষ কিছু তফাৎ আছে বলে তো মনে হয় না। ওদের ভেতর ভালো লোক যদি বা দু'একটা আছে, নেতৃত্ব করবার মত দৃঢ়তা এবং পরিকল্পনাশক্তি নেই তাদের। পার্টির নেতৃত্ব—বিশেষ করে বাংলাদেশে—গিয়ে পড়েছে একদল নিষ্ঠাহীন, হাফ্‌হার্টেড্, দ্বিপন্থী পেটি বুর্জোয়া গোষ্ঠীর হাতে। ভারতের মতো এতোবড়ো দেশের রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত ক'রে তাকে বজায় রাখতে হলে যে জাতীয় ঐক্য এবং জাতীয় শক্তির জাগরণ ছাড়া তা কোনোদিনও সম্ভব হবে না এই মূল কথাটাই এরা বুঝতে পারে না। তাই জাতীয় ঐক্যকে বরাবর এরা ভাঙতেই চেষ্টা

করেছে—তাকে গড়ে তোলার চেষ্টাতো দূরের কথা। জাতীয় ঐক্যের ভিত্‌কে এভাবে আণ্ডারমাইন্ করে চললে যে জাতির শক্তির মূলোৎপাটনই করা হয় সেটুকুমাত্র উপলব্ধি করার সামর্থ্যও এদের নেই। অথচ প্র্যাক্‌টিক্যাল্ কম্যুনিজম্ এর যিনি গুরু সেই লেনিন্ বারবার করে বলে গেছেন যে—The unity of the nation is not to be broken but to be reorganised!—স্টেট্ আর গবর্ণমেন্টের মধ্যে যে গভীর পার্থক্য তা আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলনা এদেশের অধিকাংশ কম্যুনিস্ট্‌ই। একটা গোটা জাতকে পরিচালিত করবার মত বলিষ্ঠ সংগঠনী নীতি এদের কই? কই সে দেশপ্রেম যা আনে বীর্য আর ত্যাগস্বীকারের শক্তি?'

'কিন্তু দেশপ্রেম, বীর্য, ত্যাগ, এসব যা বলছ এতো সেকেলে উচ্ছ্বাসের ভাষা শঙ্কর, কম্যুনিস্ট্‌রা কি এসবের ধার ধারে? তারা হল র‍্যাশনাল্, যুক্তিবাদী, এসব সেকেলে সেন্টিমেন্ট্‌কে তারা যথাসম্ভব বর্জন করে চলে বলেই তো জানি।'

'তোমার বিদ্রূপ মর্মান্তিক, তবু অর্থহীন যে নয় একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু শুধু এদেশের বর্তমান কম্যুনিস্ট্‌দের অবস্থা দেখেই যদি কম্যুনিস্ট্ আদর্শকে বিচার কর তবে তার চাইতে সত্যের অবমাননা আর কিছু হতে পারে না দাদা।—লেনিনের জীবনী পড়লে দেখতে পাবে তিনি শুধু কম্যুনিস্ট্ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ পেট্রিয়ট্। জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার যখন পরাজয় ঘটছিল তখন তিনি জন্মভূমিকে মাদার্ রাশিয়া বলে সম্বোধন করে যে ভাষায় তাঁর বিবৃতি দেন সে খাঁটী দেশপ্রেমিকের ভাষা। সেই ধরণের কথা এদেশের কোনো কম্যুনিস্ট্-নেতার মুখে শুনেছ? তবু যদি এদেশের কম্যুনিস্ট্-নেতাদের মধ্যে দেশের কল্যাণের দিকে চোখ রেখে সত্য কথা বলার সৎসাহস কারো থাকে তবে সে ঐ ওদের ন্যাশনালিস্ট্ উইংএর মধ্যে। বাকীদের একদল দুর্বলপন্থী, আরেক দল

আত্মহত্যার দিকে ছুটে চলেছে।—চায়নার কম্যুনিস্ট্‌রা চায়নীজ্‌ ব'লে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে,—সান্‌ ইয়াৎ সেন্‌-এর যে তিনটে নীতি তাদের মূলমন্ত্র তার একটা হল ন্যাশনালিজ্‌ম্‌—জাতীয়তা। আর সে জাতীয়তাবাদ কী রকম?—উগ্র জাতীয়তাবাদ—কলোনিয়ালিজ্‌ম্‌ও তার থেকে বাদ যায়নি। সেকথা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে 'ফাউণ্ডেশন্‌স্‌ অব্‌ চায়না'তে। এ জিনিস ভালো তা আমি বলিনে। কিন্তু যেটুকু দেশাত্মবোধ নিতান্ত প্রয়োজন—দেশের, জাতির আত্মরক্ষার জন্যে—তাকে অস্বীকার এবং আণ্ডারমাইন্‌ করবার চেষ্টা যে করে সে যে শুধু আত্মঘাতী দেশদ্রোহী তাই নয়, সে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদেরও শত্রু।'

'কিন্তু তুমিতো দুদিন আগেও সি. পি. আই. এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করেছ শঙ্কর। আজ হঠাৎ কী হল?'—নিশিকান্তর গলার সুরে বিস্ময়ের সঙ্গে একটুখানি ব্যঙ্গের আভাসও বোধকরি ছিল।

'যা ভাবছ তা নয়' বলে একটু হাসল শঙ্কর—'আমরা সংস্কারবাদী নই, রিভল্যুশনারি,—সেজন্যেই ওদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হ'ল। বর্তমানে সংখ্যায় আমরা মুষ্টিমেয়, তহবিলও আমাদের শূন্য। তাই অনেকের সঙ্গেই আমাদের সাময়িক কম্প্রোমাইজ্‌ করে চলতে হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রথম এবং শেষ উদ্দেশ্য আমরা ভুলিনি, ভুলব না। 'The task of a truly revolutionary party is not to renounce compromises once and for all, but to be able, throughout all compromises when they are unavoidable, to remain true to its principles,·········to its task of preparing the way for the revolution·········'—মার্কস্‌ এবং লেনিনের মধ্যে যদি কিছু স্থায়ী সত্য থেকে থাকে তবে নিশ্চিত

জানবে যে এই বর্তমান কন্‌ফিউজনের মধ্যেই জন্ম নিচ্ছে নতুন সংগঠনের অঙ্কুর, এবং আজকের এই যে আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ সর্বব্যাপী—এও একটা হিস্‌টোরিক্‌ নেসেসিটি, খাঁটী সাম্যবাদী শক্তির আবির্ভাবের পূর্বাবস্থা। সে আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য্য।'

'তোমার সে প্রতীক্ষিত আবির্ভাব আসতে তো অনেক দেরী শঙ্কর, খুব কম ক'রেও বোধ হয় পনেরো-কুড়ি বছরের কম হবে না! বর্তমান অবস্থায় এদেশে অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেশন্‌ চালাবার মত পার্টি কংগ্রেস ছাড়া আর কাউকেই তো দেখিনে। যাই হোক চালাচ্ছে তো ওরাই।'

'একে তুমি অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্‌ চালানো বল দাদা? Corruption has permeated every stratum of life! মন্ত্রী থেকে সুরু করে সিভিলিয়ান্‌-অফিসার, ডাক্তার, উকিল, পুলিস, ইঞ্জিনীয়ার,—ব্যবসাদারদের কথা বাদই দাও,—এমনকি প্রোফেসর এগ্‌জামিনার পর্যন্ত কারো কোনোরকম ন্যায়বুদ্ধির বালাই নেই। নেপটিজম্‌, ঘুষ, জালিয়াতি, ব্ল্যাক্‌মার্কেটিং, প্রকাশ্য রাজপথে দিনের আলোয় মলেষ্টেশন্‌ অব্‌ উইমেন, যেখানে-সেখানে রেপ্‌, মার্ডার, ডাকাতি, রাহাজানি,—এতো অর্ডার অব্‌ দি ডে!'—বলে হাসল শঙ্কর।—'এসব দেখে এখন আর আমরা দুঃখিতও হইনা বিস্মিতও হইনা'—ব'লে চলল সে—'এই সেদিন ফুড্‌ মুভ্‌মেন্টের সময় নিরীহ মানুষের ওপর যে অমানুষিক নির্যাতন চলেছিল, এই আসামে ভাষাকে উপলক্ষ্য করে যে নৃশংসতার তাণ্ডব চলে গেল নির্বিচারে,—তার তুলনা আর কোন্‌ স্বাধীন গণতান্ত্রিকদেশের ইতিহাসে আছে বলতে পার? দক্ষিণ-আফ্রিকার শার্পেভিল্‌-ম্যাসাকারের প্রতিবাদ করতে যাওয়া আর যারই হোক ভারতীয় নেতাদের সাজে না। এদেশের দিকে একবার চেয়ে বলতো দাদা, জারের রাশিয়া কিংবা লুইয়ের ফ্রান্সে কি জীবনের গ্লানি, অবমাননা, অত্যাচারএর থেকেও—'

'কিন্তু'—ওকে বাধা দিয়ে বল্‌লে নিশিকান্ত—'আমাদের প্রধানমন্ত্রী

কি সেদিন লোকসভায় বুঝিয়ে বললেন না, যে এদেশ যে কত দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে তা' এদেশে বসে ঠিক বোঝা যায় না— কেবল বিদেশে গিয়ে এদেশের দিকে তাকালেই—'

'নিশ্চয়ই'—তীব্র ব্যঙ্গ বেজে উঠ্‌ল শঙ্করের কণ্ঠে—'তাইতো ইউ. এন্‌.-এর দপ্তর থেকে প্রচারিত হচ্ছে যে India is the worst-fed of over forty nations ! আর এদেশের লোকের পরমায়ুটাও নাকি লোয়েস্ট্‌ !'—

'সবকিছুতেই সময় লাগে শঙ্কর। রাতারাতি—'

'রাতারাতিই বটে ! এমন একটা ধারণাতীত ওয়ার্‌-শক্‌ হজম ক'রেও দশ বছরের মধ্যে এতখানি বেড়ে উঠ্‌ল রাশিয়া, চায়না, ওয়েষ্ট্‌-জার্মানি,—এমনকি অ্যাটম্‌বম্ব্‌-বিধ্বস্ত জাপান পর্যন্ত, আর আমরা এমন নিশ্চিন্ততার মধ্যেও এই তেরো বছরের মধ্যে পারলাম না দেশের লোকগুলোকে তুবেলা তুমুঠো ক'রে খেতে দিতে,—হন্যে কুকুরের মত লক্ষ লক্ষ বেকার ঘুরে বেড়ায় আমাদের পথে পথে। যে দেশই আজ উন্নতি করেছে তার মূলে রয়েছে দেখ সেখানকার অল্‌ অ্যাভেলেব্‌ল্‌ ম্যান্‌-পাওয়ার এবং ট্যালেণ্ট্‌কে রীতমত হার্নেস্‌ করা হয়েছে দেশেরকাজে, জাতির কাজে। আর এ দেশে ?—Some sixty per cent of the available man-power and talent is being allowed to go to waste—*enforced* idleness on a national scale ! অথচ মর্মান্তিক পরিহাসের বিষয় এই যে ক্রমাগতই দেশশুদ্ধ লোককে হাঁক্‌ডাক্‌ ছেড়ে বলা হচ্ছে —তোমরা সবাই এসে দেশের অগ্রগতির রথের চাকায় কাঁধ লাগাও, জাতায় উন্নতির পরিকল্পনাগুলোকে রূপ দেবার কাজে সহযোগিতা কর। কীভাবে সহযোগিতা করবে ?—কেবল বড়কর্তাদের শুভদর্শন দেয়ার সময় হাততালি দিয়ে আর জয়ধ্বনি তুলে ?'

'কিন্তু যাই বলো, কংগ্রেসের মধ্যে ঐ একটা সৎলোক এখনও

আছে, ও সত্যিই সোস্যালিজ্‌ম্‌ চায়। এই কো-অপারেটিভ্‌ ফার্মিংএর ব্যাপারটাতেই দেখনা, শুধু দলের লোকের বিরোধিতার জন্যেই পারছেনা।'

'সৎ লোক!—যে লোক সত্যিই সৎ সে কখনো পারেনা একটা রিঅ্যাক্‌শনারি গ্যাঙ্‌এর হাতে হাত মিলিয়ে কাজ চালাতে, পারেনা রাষ্ট্রীয় শক্তির মদ খেয়ে মাতাল হতে, পারেনা এমন ক'রে একটা সমগ্র জাতির জীবন-মরণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে!—কো-অপারেটিভ্‌ ফার্মিং, স্টেট্‌-ট্রেডিং, সীলিংস্‌ অন্‌ ল্যাণ্ড্‌, আর সর্বোপরি ঐ সোস্যালিস্টিক্‌ প্যাটার্ণ্‌ অব্‌ সোসাইটী—চমৎকার কথার ভাণ্ডার খুলে বসেছেন সব!—কেন জানো? অজ্ঞ, উপবাসী, উন্মত্তপ্রায় জাতটাকে একটা চরম ভাঁওতা দিতে, ধূলোর ঘূর্ণী তুলে দেশের কাটা রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডটাকে ঢাকা দিতে। কিন্তু বেশীদিন ধ'রে সত্যকে লুকিয়ে রাখা যায় না দাদা, মুখোস এর মধ্যেই খুলে পড়ছে, সমস্ত দেশ জুড়ে দেখ কী গভীর অবিশ্বাস আর নৈরাশ্যের করাল ছায়া—'

'কিন্তু এখনো কংগ্রেসের মধ্যে কিছু কিছু ভালো লোক আছে শঙ্কর, এখনো তোমাদের মত তরুণরা চেষ্টা করলে একে বাঁচিয়ে তুলতে পারো।'

—'ভ্রান্তকে পথ দেখানো যায়, ঘুমন্তকে জাগানো যায়, কিন্তু গলিত শবকে প্রাণ দেবার মত মৃতসঞ্জীবনী আজো বা'র হয়নি পৃথিবীতে'—অপ্রত্যাশিতভাবে উত্তর এল বিভার কাছ থেকে।

'আমার মনের কথাটা আমার চেয়েও ভালো ক'রে তুমি বলেছ বৌদি'—বললে শঙ্কর।

'শঙ্করদাদাবাবুকে মা ডাকছেন'—ওদের কথার মধ্যেখানে পরী এসে দাঁড়ালো।

'ওঃ ভুলেই গিয়েছি মামামার সঙ্গে দেখা ক'রতে—যা জোর বক্তৃতা চলছিল'—বলে শঙ্কর সহাস্যে উঠে দাঁড়াতে বিভা বললে—

'তুমি মার ঘরে যাও শঙ্কর, আমি তোমার জল খাবার নিয়ে যাচ্ছি এক্ষুণি।'

শঙ্কর চলে যেতেই নিশিকান্ত বললে—'ও বোধহয় তোমার মাথায় আবার কতকগুলো আইডিয়া ঢুকিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু ওর যা চলে তোমার-আমার তা চলেনা বিভা। সেই ১৯৪৭ থেকে আমরা কংগ্রেস্‌কেই সাপোর্ট্‌ ক'রে আস্‌ছি আর অনেক সুবিধেও পেয়েছি সেজন্যে। আর কোনো র‍্যাডিক্যাল্‌ চেঞ্জ্‌কে সাপোর্ট্‌ করা তো আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ তাহলে আমাদের যা কিছু—আমাদের আভিজাত্য, ঐতিহ্য, আচার-বিচার, আমাদের সমস্ত অতীত আর বর্তমানকে ভেঙে ফেলে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। তাতে লাভ কী হবে? যারা পথে আছে তাদের কোনো উন্নতি হবে না, আমরাও তাদের সঙ্গে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে পথে দাঁড়াব। অ্যাব্‌সার্ড! আন্‌প্র্যাক্‌টিক্যাল্‌! আর সত্যিকারের সাম্য কখনো আসতে পারেনা এদেশে। এরা সব dreamers! অল্পবয়েস, রক্ত গরম, এখনো সংসারের আসল চেহারা চেনেনি! একবার সংসারের ঘানিকলে জোতা হয়ে গেলে বুঝবে কত তিলে কতো তেল! আরে আমরাও যখন কলেজে পড়তাম আমাদের দলেও কত ছোক্‌রা আইডিয়ালিস্ট্‌স্‌ ছিল—ধীরেন, অজিত, ললিত—দিনকতক খুব ক্যান্‌ভাস্‌টাস্‌ করতো—সব দেখগে গুছিয়ে বসেছে সংসারে। এখন সেসব কথা উঠ্‌লে হাসে, বলে—ওসব ছেলেমানুষীর দিন গিয়েছে ভাই!'

'সব মানুষই একরকম নয়'—অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল বিভার—'হুজুগে কম্যুনিস্ট্‌ আমি দেখিনি মনে করোনা। আমি কলকাতায় থাকতে আমাদের বাড়ীতে আসত অনেকে। তাদের সঙ্গে শঙ্করের অনেক তফাৎ। ওর কথা বলার ভঙ্গিতে যে আবেগ, যে জোর, তাতেই বোঝা যায় ও যা কিছু বলে নিজের অনুভূতি থেকে, শেখা বুলি নয়। আমি যদি ওকে একটুও চিনে থাকি তবে বলতে পারি ওর

ভাবধারণার ভিত্তি খুব গভীরে। সেইজন্যেই আমার মনে হয় ও বদ্‌লাতে পারে, কিন্তু সে পরিবর্তন হবে অগ্রগতি, পিছিয়ে যাওয়া নয়। ওর মন খুব ডাইনামিক্।'

বিভা যখন কথাগুলো বলছিল, ওর মুখের দিকে চেয়েছিল নিশিকান্ত। স্ত্রীর মুখের ভাবে, কণ্ঠস্বরে এমন একটি শ্রদ্ধার ভাব দেখতে পেল ও, সেটি কেন জানি ওকে আঘাত করল। নিশিকান্ত সম্বন্ধে এমন ক'রে বিভা বলবে কি তার পরোক্ষে আর কারো কাছে? বিভার দৃষ্টি এড়িয়ে জানালার বাইরে চেয়ে নিশিকান্ত বললে—'চরম প্রগতিবাদ ফিলসফি হিসেবে বাঞ্ছনীয় হতে পারে বিভা, কিন্তু বাস্তবজীবনের সব ক্ষেত্রে নয়। জীবনে অনেক কিছুকেই মেনে নিতে হয়, স্থিতিশীলতা না থাকলে সমাজ-সংসারের সমস্ত কাজকর্ম অচল হয়ে পড়ে। মানুষ তো ধূমকেতু নয়',—এবার নিশিকান্তর কণ্ঠস্বরে যে একটা সূক্ষ্ম অভিমান বাজল তা' বিভার লক্ষ্য এড়াল না,—'জন্ম থেকে যে পরিবেশে মানুষ বড় হয় তার প্রতিটি অণুতে অণুতে সে বাঁধা প'ড়ে যায়। তার প্রিয়-পরিজন, যাদের রক্তমাংসমজ্জার সাথে তার সমস্ত সত্তা এক হয়ে আছে,—সেই পরিবেশ, সেই মন্দির, সেই পূজো, সেই প্রতিমা,—সমস্তখানে তার ভালবাসায়, তার শ্রদ্ধায়, মমতায়, তার সমস্ত আত্মা ছড়িয়ে থাকে, তাকে একমুহূর্তে ছেড়ে যাওয়া কি এতই সহজ?—এতই বাঞ্ছনীয়?—আদর্শ যত বড় হোক, মানুষের প্রেম ছাড়া সে বাঁচতে পারেনা, সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। দেশ বলতে কী বোঝায় বিভা? মাটি, না মানুষ? যদি বল মাটি, তবে সে একটা ভৌগোলিক সীমা মাত্র, ইতিহাসের গতির সঙ্গে বদলায়। আর যদি বল মানুষ, তবে সে মাটির চেয়েও দূর। কেননা মাটি জড়, সে সচেতন আঘাত করতে জানেনা। কিন্তু মানুষ? ঐ পাশের বাড়ীর লোক তোমার মঙ্গলগ্রহের অধিবাসীর চেয়েও পর। যারা তোমার যথার্থ আপন

তারা আজও আছে কালও থাকবে, কিন্তু চেষ্টা দ্বারা তুমি কাউকে আপন করতে পারবে না,—খৃষ্টের মত প্রেমিকও পারেননি। তবু কি বলবে যাদের তুমি কেউ নও, তোমার সর্বনাশ হ'লেও যাদের কিছুই আসে যায় না, তারাই তোমার একমাত্র আপন, আর যাদের তুমি জীবনসর্বস্ব তারা তোমার কেউ নয়? আমি কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও এ ভাবতে পারিনে বিভা, যে এই আমার বুড়ো মা, বুড়ো রুগ্ন বাবা, এই আমাদের আশ্রিত পরিজন, তুমি—যার অসুখের সময় আমি ঐ মন্দিরে সারারাত প'ড়ে থাকতুম আর কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতুম, আর ঐ যে আমার ঠাকুর—যেখানে গেলে সব জ্বালা, সব ব্যথা জুড়িয়ে যায়,—এরা আমার কেউ নয়!'

'কিন্তু এ তুমি যা বলছ এতো আমার মনের কথা নয়!'—ব্যথাহতস্বরে বিভা বললে—'তুমি আমাকে বুঝতে পারলেনা কোনো দিন—'

'হয়ত তাই হবে বিভা, আমারি বোঝার ভুল। কিন্তু কোথায় যে একটা কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করে আমার মনে······থাক্‌ ওকথা। তুমি যাও বিভা, শঙ্করকে খেতে দিয়ে এস, অনেকক্ষণ হ'ল এসেছে।'

চার

সেদিন তুপুরবেলা বিভা ব'সে ব'সে শাশুড়ীকে গীতা পড়ে শোনাচ্ছিল। ওর সুললিত কণ্ঠে ঐ বিশ্বরূপদর্শন অংশটার আবৃত্তি শুনতে ভালোবাসেন কিরণময়ী। যখন সে প্রাণ ঢেলে গানের সুরে পড়ে—দিব্যমাল্যাম্বরধরম্ দিব্যগন্ধানুলেপনম্—তখন সেই অনুপম শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী মূর্তি ভেসে ওঠে শ্রোতার চোখের সামনে। বিভা খানিকটা ক'রে পড়ে, তারপর ব্যাখ্যা করে নিজের স্বচ্ছন্দ প্রাঞ্জল ভাষায়, আবার পড়ে, আবার ব্যাখ্যা করে।

এমনি করে একসময় বিশ্বরূপদর্শন অধ্যায়টা শেষ হয়ে গেল। কিরণময়ী বললেন—'আর থাক্ মা, এস আমার মাথার কাছে বস, একটু গল্প কর।' বিভা ওঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর নানা-রকম এটা সেটা গল্প করছে হঠাৎ কিরণময়ীর চোখে পড়ল বিভার হাতে যে হীরে-সেট্‌করা ব্রেস্‌লেট্‌টা ছিল, সেটা নেই। 'তোমার ব্রেস্‌লেট্ গাছা খুলে রেখেছ কেন মা? বেশ্‌তো দেখাতো!'—সস্নেহকণ্ঠে তিনি বললেন। বিভা একটু চুপ করে রইল, তারপর মৃতুকণ্ঠে বললে—'ব্রেস্‌লেট্‌টা আমি শঙ্করকে দিয়েছি মা। রিলিফ্-ওয়ার্কে যাচ্ছে, বললে যে যা পারে সাহায্য দিলে ও নেবে। তাই আমি দিয়েছি।'

শুনে কিরণময়ী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তু'পাঁচ টাকা দিলে সেটা বোঝা যায়, কিন্তু অতোদামী ব্রেস্‌লেট্‌……

'তোমার শ্বশুর জানতে পারলে খুবই রাগ করবেন বৌমা,—আমাদের জিজ্ঞেস না করে দেয়া একেবারেই তোমার উচিত হয়নি। তুমি ছেলেমানুষ ভালোমন্দ জাননা'—তাঁর কণ্ঠ রীতিমত গম্ভীর।

'আপনি ভাববেন না মা, যে জিনিস শঙ্করের হাতে গেছে তার অসদ্‌ব্যবহার কখনো হতেই পারেনা। আমি খুব বেশী কিছু জানিনে

বাইরের পৃথিবীর এটা ঠিক, কিন্তু যদ্দুর মনে হয় গরীবদেরকে সাহায্যকরার মধ্যে মন্দ কিছু নেই। আর'—বলবনা বলবনা করেও বেরিয়ে গেল বিভার মুখ দিয়ে—'বাবা বিয়ের সময় নিজের হাতে দিয়েছিলেন, তাই ভেবেছিলুম ওটার ওপর বুঝি আমার অধিকার আছে—'

'অধিকারের কথা তো নয় বৌমা, কথা হচ্ছে কর্ত্তব্যের। গুরুজনদের জিজ্ঞেস না ক'রে কোনো কাজ তোমার করা উচিত নয়। নিশা জানে–?'

শান্তস্বভাব কিরণময়ীও রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন বধূর ব্যবহারে।

'উনি এখনো জানেন না, বলব এক সময় ভেবেছিলুম। তবে উনি কিছু বলবেন না আমি জানি।'

'বলাটাই সব নয় বৌমা! সে যদি দুঃখ পায় সেটা তোমার কাছে কিছু নয়? ছেলেবেলা থেকে ও বড় অভিমানী। ওর যে ভালোবাসা তুমি পেয়েছ তা সাত জন্মের তপস্যাতেও মেয়েরা পায়না বৌমা! কিন্তু সে ভালোবাসার মূল্য দিতে জানোনা তুমি! তবে এটুকু জেনে রেখো মা, যে ও তোমাকে না জানিয়ে এমন একটা কাজ কখনো করত না!'

সংযতস্বভাবা কিরণময়া এর বেশী আর কিছু বলতে পারলেন না। কিন্তু বধূর ঔদ্ধত্য যে তাঁকে কতখানি আঘাত করেছে তা' বোঝা গেল যখন তিনি উঠে চ'লে গেলেন ঘর ছেড়ে, বধূর দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না ক'রে।

নিজের শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন কিরণময়ী। বিভার ব্যবহারে তিনি যতখানি বিস্মিত হয়েছেন তার থেকে বেশী হয়েছেন ক্ষুব্ধ। চেষ্টা করছেন ভুলতে, কিন্তু পারছেননা তো! কেবলই অতীত ফিরে ফিরে ভেসে উঠ্‌ছে মনের ওপর তলায়। বিভা যে আজ নিশিকান্তকে স্বামীরূপে পেয়েছে, সে কার জন্যে? কিরণময়ীর

আন্তরিক সমর্থন এবং সাহায্য না পেলে কি ওদের মিলন এত সহজ হ'ত? শুধু মাত্র এর জন্যেই কি তার কাছে কিছু কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য নয় কিরণময়ীর? আর শুধু কৃতজ্ঞতাই বা কেন? নিজের স্বামীর মতামতটাও কি একবার জিজ্ঞাসা করা তার উচিত ছিল না? অথচ সে নাকি একদিন নিশিকান্তকে ভালোবেসেছিল,—অন্ততঃ ছেলে তাই বুঝিয়েছিল তাঁকে। তারপর—পুরুত্‌ঠাকুরের স্ত্রীর সাহায্যে কত কৌশলে তিনি যে যোগাযোগ করে কর্তার মত করিয়ে এ বিয়ে ঘটান, সে শুধু জানেন তিনি নিজে আর জানে নিশিকান্ত। কর্তাতো এখনও পর্যন্ত সে পূর্বরাগ-পর্বের কিছুই জানেন না। তিনি জানেন ভট্‌চাজ্‌ মশাই একটি সুলক্ষণা মেয়ের সন্ধান এনেছিলেন, আর মেয়েটিকে তাঁর গৃহিণী এক নেমতন্ন বাড়ীতে দেখেছেন এবং পছন্দ করেছেন। মেয়ের বাপের অবস্থা বিশেষ ভালো নয়, কিন্তু পরম কুলীন ও বনেদী বংশ, তার ওপর পাত্রপাত্রীর কুষ্ঠীর রাজযোটক। কাজেই এই বিয়েতে মত দিতে তাঁর বিলম্ব হয়নি। কিন্তু আসল ব্যাপারটা জানেন কেবল কিরণময়ী। অবশ্য বিভাকে তাঁর ভালোও লেগেছিল। এমন বিদ্যাবুদ্ধি, এমন মধুকণ্ঠ, এমন সুন্দর ব্যবহার, আর সুন্দরী না হলেও তার মুখশ্রীতে একটি ললিত মাধুর্য্য ছিল। কিন্তু আজ?—একী ব্যবহার করল বিভা? তাঁর এবং তাঁর সন্তানের সমস্ত স্নেহ-প্রেমের মর্যাদাকে ধূলোয় লুটিয়ে দিল সে!—এই মেয়েকেই তাঁর সন্তান ভালোবেসেছিল, এখনও বাসে, এবং চিরদিনই বোধ হয় বাসবে। বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই। ছেলেকে তিনি চেনেন, এমনই তার প্রকৃতি যে ঘর ভেঙে গেলেও মেনে নেবেনা সে, অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে বলবে—না, ওঘর ঠিকই আছে, বেশ চলে যাবে বাকী কটা দিন!—এমনই অন্ধ ভালোবাসা!

ছেলের জন্যে গভীর বেদনায় ভ'রে গেল তাঁর হৃদয়। ঐ হীরের ব্রেস্‌লেট্‌ বিভার বাবারই হাতে ক'রে দেয়া বটে, কিন্তু বিভা জানেনা

ওর দাম দিয়েছিল নিশিকান্ত নিজে, আর পছন্দও ক'রে এসেছিল নিজে কলকাতায় হ্যামিল্টনের দোকান থেকে। একথা কিরণময়ী ব'লে দিতে পারতেন বিভার মুখের ওপর। কিন্তু বলেননি তার কারণ—তাঁর মনে হয়েছিল জিনিসটা যারই দেয়া হোক্, এখন সেটা বিভারই। এই বাড়ী, এই লাইব্রেরী, এই সম্পত্তি, যা কিছু আছে তাঁদের সবই তো ওদেরই দুজনের জন্যে। তবে সে নিয়ে কেন ঝগড়া করতে যাবেন?—তাঁর একমাত্র ক্ষোভ যে বিভা তাঁদের কাউকে, এমনকি স্বামীকে পর্যন্ত একবার বলা দরকার মনে করল না! জিনিসটা যদি বিভার পৈতৃক সম্পত্তি কেন, ওর নিজের রোজগার করা টাকাতেই কেনা হ'ত, তবু কি কাউকে—এমন কি স্বামীকেও না জিজ্ঞেস ক'রে একাজ তার করা উচিত হ'ত?—কখনই না। কিরণময়ীর মন বলে এতে কেবল প্রমাণ হয় যে বিভা এবাড়ীর কাউকে ভালোও বাসে না, শ্রদ্ধাও করেনা। 'এটা আমার বাবার দেয়া!'—যেন নিশিকান্ত আর ওর সুখসম্পদ্‌ভাগ্য সমস্ত অবিচ্ছেদ্য, এক নয়। এরই নাম প্রেম!—এরই জয়গান করে আজকালকার ছেলেমেয়েরা। আপন সন্তানকে ভ্রান্তির যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছেন তিনি, আর তো ফেরবার পথ নেই!

* * * *

* * * *

দুপুরবেলা অসময়ে নিজের ঘরে বিভাকে দেখে অবাক হ'ল নিশিকান্ত। সেরেস্তার কাজ সেরে এসময়টা সে একলাই একটু বিশ্রাম করে শুয়ে শুয়ে। স্ত্রীর মুখের দিকে চোখ পড়তে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। এত গম্ভীর আর নীরস কেন? কিছু হ'ল নাকি? কিন্তু——শাশুড়া-বৌয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্কই তো দেখেছে সে এতদিন!

'আমার হীরে-সেট্‌করা ব্রেস্‌লেট্‌টা শঙ্করকে রিলিফ্‌এর কাজের জন্যে দিয়ে দিয়েছি!'—বিনা ভূমিকায় বিভা ওর মাথার কাছে এসে ব'লে গেল কথাগুলো।

'তা এমন হঠাৎ এভাবে বলছ কেন?'—উঠে বসল নিশিকান্ত—স্ত্রীর কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য ক'রে।

'মা বললেন ওটা দেয়া আমার অন্যায় হয়েছে কাউকে জিজ্ঞেস না ক'রে, বিশেষ তোমাকে না ব'লে।'

'মা বলুন গিয়ে যা'হোক, বুড়োমানুষ, ওঁর কথায় রাগ করার কোনো মানে হয়? আমি কিছু মনে করিনি, শঙ্করকে দিয়েছ ভালোই করেছ। তবে ওর বদলে টাকা দিলেও পারতে, আমাকে বললেই হ'ত। আমিতো বাধা দিতুম না বিভা!'

'কিন্তু উনি উঠে চলে গেলেন আমার ওপর রাগ করে। অথচ আমি এমন কিছু অন্যায় করিনি—আমিতো জিনিসটা জলে ফেলে দিইনি! আর তোমাদেরকে লুকিয়ে কোনোকিছু করার উদ্দেশ্যও আমার ছিলনা। আমি ভাবতেই পারিনি এনিয়ে কোনো অশান্তি হ'তে পারে। যদি তোমরা আমাকে মেনে না নিতে পার—বিদায় দাও—এই মুহূর্তেই চলে যাচ্ছি। আর ব্রেস্‌লেটের দাম আমি যেমন ক'রেই হোক্ তোমাদের শোধ দেব, যদি ভিক্ষে ক'রে খেতে হয় তবুও।'

'ছিঃ বিভা'—ওকে নিশিকান্ত টেনে নিল বুকের কাছে—'এই তুচ্ছ ব্যাপারটা নিয়ে এমন মান-অভিমান করে? তোমার জিনিস তুমি যেমন ইচ্ছে ব্যবহার করবে—এতে কার কী বলবার আছে? মা বলেছেন—সে শুধু তোমায় তিনি অত্যন্ত ভালোবাসেন ব'লেই। তোমার অলঙ্কার এমনি ক'রে চ'লে যাবে এটা উনি সইতে পারেননি। সংসারী মানুষ, সেকেলে, গওনা ওঁদের কাছে খুব প্রিয় জিনিস। তোমার মত মুক্তমন নিয়ে মানুষ যদি জন্মাত ঘরে ঘরে তবে সংসারের চেহারাই হ'য়ে যেত আলাদা। ওঁর কোথায় বেজেছে

জান? তুমি যে কাউকে বলনি ওটা দেবার আগে এতে উনি মনে করেছেন তুমি আমাদেরকে পর মনে কর। আর তোমাকে এখনো উনি ছেলেমানুষ ছাড়া ভাবতে পারেননা। তোমায় বলেছেন নিজের মেয়ের মত ক'রেই, পর ভাবলে বলতেন না। এতদিন তো দেখেছ তাঁকে, কোনোদিন কি পরের মত তোমাকে—'

'কিন্তু'—স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে বললে বিভা—'আমি যদি আজ তোমাদের অন্নপালিত না হতুম, তাহ'লেও কি উনি ঐরকম ব্যবহারই করতেন?'

'সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই, বিভা! তোমাকে ছেলের বউ বলেই দেখেছেন উনি, আশ্রিতা বলে দেখেননি—দেখতে পারেন না। শুধু মা নন, বিভা, কেউই পারে না। তুমি এ বাড়ীর কর্ত্রী, মা-বাবা আর ক'দিন? এ বাড়ীর সর্বস্ব তোমারই, তবে ওঁরা বুড়ো হয়েছেন, গুরুজন, আমাদেরই অবলম্বন ক'রে বেঁচে আছেন, তাই ওঁদেরকে সম্মান আর শান্তি দেয়া আমাদের কর্তব্য।'

নিশিকান্তর কথায় বিভার মনের মেঘ কিছুটা কেটে গেল। এত ভালো, এত উদার স্নেহশীল ওর স্বামী—ভাবতে কী যে আনন্দ! এইজন্যেই নিশিকান্তকে ও ভালোবাসে, এইজন্যেই ভালোবেসেছিল—কয়েকদিনের আলাপে। এমন নির্বিরোধী, শান্ত, সুন্দর ওর প্রকৃতি। অথচ বিভা কী ব্যবহারই না করছে ক'দিন ওর সঙ্গে। সত্যিইতো অন্যলোকের ভুলের জন্যে ওকে আঘাত দেয়ার তো কোনো মানেই হয়না। বিভা, আর ওর নিজের বাড়ীর আত্মীয়স্বজন, এদুইয়ের মধ্যে সেতু বাঁধ্‌বার নিরন্তর চেষ্টা করছে ও। ওর বাপ-মাকেও ও ভালোবাসে, এইতো ওর অপরাধ! কিন্তু এই প্রেমময় প্রকৃতি যদি ওর না হ'ত তবে বিভাকেও তো সে এমন ক'রে ভালোবাসতে পারত না! তবে ও শান্তি চায়—ওর প্রকৃতিটাই ওই। ও কারো সঙ্গে বিবাদ করতে চায়না। বিভা দেখেছে আত্মীয়-

পরিজনের সঙ্গে ওর ব্যবহার—কেউ মুখের ওপর রূঢ় ব্যবহার করলেও ও প্রত্যুত্তর করবেনা, যতক্ষণ না ব্যাপারটা চরমে পৌঁছয়।

অনেকখানি শান্তমনে বিভা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। এখন ওর মনটা আপোষের জন্যে উন্মুখ। সত্যি, বুড়ো শাশুড়ীকে অতটা কড়া কথা তার না বললই হ'ত। এই হতচ্ছাড়া বদ্‌রাগী স্বভাবটা যদি ও ছাড়তে পারত! যখন ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখ দিয়ে কঠিন কথা বা'র হ'য়ে যায়। কখনো কখনো উত্তেজনাটা কিছুক্ষণ, এমনকি কিছুদিন ধ'রেও র'য়ে যায়। কিন্তু তারপরে মনটা আপনিই শান্ত হ'য়ে আসে। তখন ভিতরে ভিতরে ও ক্ষমাপ্রার্থী হ'য়ে ওঠে, এমনকি যেখানে ওর কোনো অন্যায় নেই সেখানেও ও আপোষ ক'রে নিতে চায়। বিশেষ যাদের ও ভালোবাসে তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ও আদৌ সইতে পারেনা।

* * * *

পাঁচ

রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে রায়বাড়ীতে আজ বিশেষ উৎসব। সকাল থেকে চলেছে পূজা, আরতি, প্রসাদ-বিতরণ, আর ভোজের উদ্যোগপর্ব।

দলে দলে লোক আসছে, যাচ্ছে—বিশেষ ক'রে গরীব আর 'নীচু'-জাতের মেয়েরা। কপালে কুঙ্কুমের ছোপ, আঁচলে প্রসাদী মুড়কী আর সন্দেশ বেঁধে নিয়ে ফিরছে, আশপাশের লোকদের জিজ্ঞেস ক'রে নিচ্ছে খাওয়া-দাওয়া কখন হবে, যাত্রাইবা সুরু হবে কখন।

নাটমণ্ডপের সামনে রাজ্যের ছোট ছেলেমেয়ের ভীড়। আসর সাজানো হচ্ছে—পালা হবে 'মাথুর'। কিছুদূরে যাত্রাদলের তাঁবুতে অভিনয়ের মহড়া চলেছে সরবে। নানাছাঁদে মেয়েলি ঢঙে কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গের রিহার্সাল্ দিচ্ছে ঝাঁকড়া-চুলো 'রাধিকা-বালক' আর তার সখী, অর্থাৎ সখার দল। তাঁবুর চারপাশে উঁকিঝুঁকি মারছে কৌতূহলী বালক-বালিকা, আর যাত্রাদলের তামাসা দেখতে বয়স্ক মানুষও দাঁড়িয়ে গেছে দু'চারজন। লোক এসে মাঝে মাঝে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিছুদূর, কিন্তু ছেলেমেয়ের দল যেমনি দেখছে যে ধারেকাছে তাড়া দেবার কেউ নেই, অমনি আবার মৌমাছির মত এসে ঝাঁক বাঁধছে তাঁবুর রন্ধ্রপথে।

—অপরাহ্ণের রাঙা রোদ্দুর এলিয়ে পড়েছে মন্দিরের চূড়োয়। পুজোর ঘরের ভিতরটা আবছা অন্ধকার, তার মধ্যে ঝকমক্ করছে শ্রীরাধা আর গোপীনাথজীর বিগ্রহমূর্তি—সোণায় গড়া—বাইরে থেকেও দেখতে পাচ্ছে নিশিকান্ত। সামনে বিরাট চত্বরের সর্বত্র আলপনা, ছড়ানো লাজ আর মঠ, আর মুঠো মুঠো আবীর—ঘন বেগুনি আর গাঢ়লাল। ঠাকুরবাড়ীর পূর্বাংশের অলিন্দ থেকে ভেসে আসছে নামসংকীর্তন, কীর্তনীয়ার দল নগর-পরিক্রমা ক'রে এতক্ষণে ফিরেছে তবে। একবার খুব জোর সমবেত কণ্ঠ আর খোলকরতাল বেজে উঠেই তারপর ধীরলয়ে চলেছে আবার, বোঝা যাচ্ছে শমে

আসতে আর বেশী দেরী নাই। ক্লান্তদিনের করুণলাবণ্যস্পর্শ লেগেছে বেলাশেষের স্তিমিত আলোয়, দেউলের কার্ণিশে বাসাবাঁধা পায়রার কলরবে, কীর্ত্তনের সুরে আর খোল-মন্দিরার বোলে।

'ছোটবাবু, গিন্নামা কী বলছেন—' গোবিন্দ এসে দাঁড়ালো।

'এখুনি যাচ্ছি, বল্ গিয়ে মাকে।'

কিরণময়ী খেতে ডেকেছেন তাকে, জানে নিশিকান্ত। সারাদিনটা ছুটোছুটি গেছে, খাওয়া আজ এবাড়ীর কারোরই হয়নি প্রায়, একমাত্র শশিকান্ত ছাড়া। লোকের আনাগোনার তো বিরাম নেই সারাদিন, তার ওপর ভোজের ব্যবস্থা।

এ রাসের উৎসব তো ওদের আজকের নয়! বহু, বহুকালের পুরাতন। এই দেবালয়ও আজকের নয়। কবে কোন্ আদিপুরুষ নিশিকান্তের, —কোন্ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ রাধাগোবিন্দ রায়—গড়েছিল এই মন্দির। কঠিন পাষাণে অক্ষয় ক'রে রাখতে চেয়েছিল তার ভক্তির গরিমাকে। কিন্তু কালের গতিতো নির্ম্মম! দীর্ঘ প্রস্তর প্রাচীরের এখানে সেখানে ভাঙ্গন ধরেছে, পাথরের গায়ের রঙ হয়েছে বিবর্ণ, মলিন। পাষাণের গাঁথ্নিকে অগ্রাহ্য ক'রে একধারে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে একটা অশ্বত্থের গাছ, দীর্ঘ টানা ফাটলের অন্ধকার গহ্বরে সারি সারি শিকড় চালিয়ে দিয়েছে প্রাচীরের অস্থিপঞ্জর ভেদ ক'রে বহুদূরে, মাটির নীচে।—ঘন সবুজ ভেলভেটের মত নরম মসৃণ শৈবালের আস্তরণ পড়েছে অদূরে বাঁধানো পুকুরের ভগ্নঘাটের কিনারে কিনারে। মন্দিরের দাওয়ার নীচে, ওধারে, তুলসীমণ্ডপের তলায় শেষ-অপরাহ্ণের বিষণ্ণম্লান ছায়া নামে—দীর্ঘ, সুগম্ভীর।

* * * *

'পরিবেষণের কী ব্যবস্থা করেছিস নিশা ?'

দোরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কথাটা কানে যেতে থমকে দাঁড়ালো বিভা। দেখতে পেল ঘরের ভিতরে ধূপদানিতে ধূপ আর গুগ্‌গুল্ মেশাতে মেশাতে কিরণময়ী কথা বলছেন নিশিকান্তের সঙ্গে।

'এবারে অন্যদের খাওয়া শেষ হবার আগেই কাঙ্গালীদেরও বসিয়ে দিয়েছি মা, নইলে ওদের খেতে সেই বড় রাত হ'য়ে যায়। বাইরে ওদের খেতে দেবে'—বললে নিশিকান্ত, এক গেলাস্ সরবৎ খেয়ে মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে।

'সেটা কি ঠিক হবে নিশা ? এঁরা অপমান মনে করতে পারেন !'

'না মা, এতে কারো কোনো অপমান নেই—আমি খুব ভেবে দেখেছি।'

'যাইহোক ভদ্রলোকদের প্রতি যেন ত্রুটি না হয়—'

আর শুনবার প্রবৃত্তি হয় না বিভার। দ্রুতপদে স'রে যায় সে।

'সে ভয় নেই মা'—উত্তর দেয় নিশিকান্ত—'আমি নিজে দাঁড়িয়ে দেখছি প্রত্যেকটা ব্যাচ্। আর বাবাওতো দেখছেন। খাটুনি হয়েছে ওঁর আজ, আজ যেন উনি আর রাত না জাগেন মা, কাল সারারাত কীর্তন শুনেছেন।'

'মাথুর পালা হবে, উনি শুনবেনই নিশা—'

'এটাকি ভালো হবে মা ? ডাক্তারবাবু বারবার ক'রে ব'লে দিয়েছেন,—রাত জাগলে তখন শরীর খারাপ হবে, তুমি বারণ ক'রো।'

'আমি বারণ করলে শুনবেন কেন ?'—হাসলেন কিরণময়ী—'তাছাড়া—এতো এমনি জাগা নয় ! কৃষ্ণনাম হল অমৃত, ওতে জরাব্যাধিমৃত্যু সবের পারে নিয়ে যায়। কৃষ্ণনাম শোনায় বাধা দিতে আমি পারবোনা নিশা।'

'এগুলো কোথায় রাখব মা ?'—বলতে বলতে দাসী মানদা দেখা দেল দ্বারদেশে, তার হাতে এক বিরাট ঝুড়িতে টাটকা পদ্মের রাশ।

'কে আনলে, সতু? যা, বৌমার কাছে দিয়ে আয়, বৌমা মালা গাঁথছে মাঝের ঘরে।'

'আচ্ছা মা, আমি তাহ'লে এখন ওদিকে একটু দেখি'—বললে নিশিকান্ত।

'আচ্ছা, কিন্তু বেশী দূরে কোথাও যাসনে, ডাকলে যেন পাই। এখনি আবার ঠাকুরমশাই কী দরকার বলবেন।'

বাড়ী থেকে বা'র হয়ে মন্দিরের আঙিনা পেরিয়ে অতিথ্‌শালায় এসে উপস্থিত হ'ল নিশিকান্ত। এককালে এটা বারোমেসে অতিথ্‌শালা ছিল রায়দের, এখন শুধু পূজোপার্বণেই ব্যবহার হয়।

'আরো লুচি আনো', 'পোলাও কই?' 'এদিকে রাব্‌ড়ী দিয়ে যাও', 'আরে এদিকে দই দিচ্ছ না কেন?', 'কই হে সন্দেশ কই?'—এম্‌নিধারা কলরবে সমস্ত স্থানটা মুখরিত। চত্বরের একপ্রান্তে শশিকান্ত মোড়ায় ব'সে আছেন, পরণে তাঁর শুভ্র গরদের থান।

'চক্কোত্তিমশাই, আপনিতো বিশেষকিছু খাচ্ছেন না দেখছি!'—গদগদবিনয়ের সুরে অভিযোগ করেন শশিকান্ত।

তখন প্রায় পোয়াটাক চালের ঘৃতপক্ক অন্ন, খানদশ লুচি, ছ'টা ক্ষীরের চম্‌চম্‌, আটটা সন্দেশ, আধডজন লেডিগেনি, ছানার পায়েস এবং গোটাছয়েক মালপো শেষ করার পর একটি বড় খুরীতে আধসেরটাক রাব্‌ড়ী পার ক'রতে ব্যস্ত ছিলেন চক্কোত্তিমশাই, কাজেই তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারলেন না। সমস্ত রাব্‌ড়ীটুকু সাপ্‌টে শেষ ক'রে আঙুল চুষতে চুষতে একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে তিনি বললেন—

'আর ভাই আমাদের কথা ছেড়ে দিন—আমাদের এখন রস যাকিছু সে ঐ রসো-বৈ-রসতম গোবিন্দবল্লভ। ভোগরস সেতো এই এদের জন্যে। খাও ভবেশ খাও, লজ্জা কি? তোমাদেরি তো বয়েস'—ব'লে তিনি পার্শ্বোপবিষ্ট যুবকটির পিঠ চাপ্‌ড়ে দিলেন।

পাশে একহারা চেহারার যে ছিপ্‌ছিপে যুবকটি ব'সেছিল সে আর কেউ নয়, তাঁরই ছোট জামাইয়ের ভাই। কলকাতার সদাগরী অফিসে কেরাণীর কাজ করে, অম্বলের রোগী, দিনকয়েকের জন্যে হাওয়া বদল ক'রতে এসেছে এখানে। তাই তাকে সঙ্গে ক'রেই নিয়ে এসেছেন তিনি। বেচারা এইদলে ব'সতে চায়নি, কিন্তু চক্কোত্তির পীড়াপীড়িতে এবং উপস্থিত সকলের অনুরোধে তাকে ব'সতে হয়েছে এখানে।

'খাও বাবা খাও'—অনুরোধ করেই শশিকান্ত হাঁক দিলেন—

'ওরে, এখানে সন্দেশ আর লেডিগেনি দে——'

'ওসব দিতে বারণ করুন স্যার্ দয়া ক'রে'—অপিসে কাজ ক'রে ক'রে সবাইকেই 'স্যার্' বলা ভবেশের অভ্যেস হ'য়ে গেছে—'তার চাইতে, স্যার্, যদি একটু সোডি-বাই-কার্ব্ পাওয়া যেত——' করুণ মিনতি তার চোখেমুখে ঝ'রে পড়ে।

'কী বললে, পায়েস আর রাব্‌ড়ী দেবে ?'—

হট্টগোলের মধ্যে ভবেশের ক্ষীণকণ্ঠ-নিঃসৃত সোডির দন্ত্য'স' আর 'কার্ব্' এর 'র্ব্'টুকু শুনে তাই ঠাওরালেন চক্কোত্তিমশাই।

'আজ্ঞে বলছি সোডি-বাই-কার্ব্, ওষুধ—অম্বলটা বড় চাগিয়ে উঠেছে—'বলতে বলতে নিজের ওপর-পেটের কাছটা অস্থিরভাবে চেপে ধরল ভবেশ।

বিস্মিত, ক্ষুব্ধ অসহায় দৃষ্টিতে ওর পাতে-প'ড়ে-থাকা মালপো, সন্দেশ আর চমচমের দিকে তাকালেন চক্কোত্তিমশাই। আঃ, এমন ভালো ভালো মালগুলো একেবারে ফেলা যাবে ?—নয়তো যাবে কোনো ছোটলোকের পেটে—যারা ঐ পাত কুড়োতে আসে—সেওতো ফেলা যাবারই সামিল !

চক্কোত্তিমশাইয়ের খাওয়া হয়ে গেল শশিকান্তর নির্দেশমত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কুয়োতলা পর্যন্ত আসে নিশিকান্ত। নিজে হাতে জল

ঢেলে দেয় তাঁর জন্যে, পরিপাটি ক'রে হাত-পা-মুখ প্রক্ষালন করেন চক্কোত্তিমশাই।

—'একিহে নিশিকান্ত,ভদ্দলোকদের সঙ্গেই কাঙ্গালীদের বসিয়েচ যে দেখ্‌চি ?'—হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি অতিথ্‌শালার পশ্চাদ্দিকের অঙ্গনটুকুর উপর চোখ পড়তেই। সেদিকে, রোয়াকের নীচে, কতকগুলি কাঙ্গালী শ্রেণীবদ্ধভাবে খেতে ব'সে গিয়েছে তখন হৈ-হল্লা ক'রে।

'এ আবার কেমনধারা প্রথা ?'—কাছের জলচৌকীটার উপর ব'সে প'ড়ে ব'লে চলেন তিনি—'এমন তো কোনো যজ্ঞযাগ ক্রিয়াকর্মে দেখিনি বাপু! তোমার ওই কুড়ুম্বোর মুখুজ্জেদের বাড়ীও তো সেদিন পঞ্চম-দোলের নেমন্তন্ন খেয়ে এলাম, তা ছোটলোকদের খেতে দিলে সেই সবার শেষে—সমস্ত বামুন-কায়েত আর নবশাখদের খাওয়া-দাওয়া হ'য়ে যাবার পর। নবশাখ ব'লতে এখন তো আর তোমরা বাছ-বিচের কিছুই রাখ না, কিন্তু শাস্ত্রে নবশাখ ব'লতে ঠিক ঠিক কা'দের বোঝায় জান ?—

মালী, তিলী, তাম্‌লী,—
গোপ, নাপিত, গোছালী,—
কামার, কুমোর, পুঁটুলি,—অথবা পেটিলী!'

ছড়াটি বলতে বলতে চক্কোত্তিমশাইয়ের প্রগাঢ় জ্ঞান-গরিমার দীপ্তি ছড়িয়ে প'ড়ল তাঁর সারা মুখমণ্ডলে।

এদিকে ভবেশ ততক্ষণে একটু সুস্থ হ'য়ে চক্কোত্তিমশাইয়ের পিছন পিছন কুয়োতলায় এসে দাঁড়িয়েছে। সে তাঁর কথা শুনে কোনোরকমে হাসি চেপে জিজ্ঞেস করে—

'আচ্ছা তাউই মশাই—গোপ মানে, বুঝ্‌লুম, যা'রা দুধ দেয়। কিন্তু আপনার গোছালী, পুঁটুলী,—এসব আবার কি? আর

এগুলো কি সত্যি সত্যিই শাস্ত্রের বচন, না পল্লীগ্রামের ভট্চাজ্‌মশাইদের তৈরী করা শাস্ত্র?'

'আরে এসব তোমাদের ঐ লালবেহারীদে'র ডাফ্-কলেজে প'ড়ে শেখা যায় না, বুঝলে?'—তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলেন চক্কোত্তিমশাই—'এসব মোটেই গেঁয়ো-ভট্চাজ্‌দের করা জিনিস নয়! নবশাখ এসেছে পরাশরসংহিতার নবশায়ক শব্দ থেকে,—তবে দেশাচার ভেদে এইসব শায়ক বা শ্রেণীর নাম আর বৃত্তির কিছু কিছু তফাৎ ঘটেছে বটে।'

'তাহ'লে আপনার গোছালী, পুঁটুলী—এসবেরও অর্থ আছে নিশ্চয়ই—'

'আলবৎ!'—ভবেশের কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই ব'লে ওঠেন চক্কোত্তিমশাই—'তোমার ঐ গোপ মানে হ'ল গিয়ে সদ্‌গোপ—যা'দের পেশা ছিল চায। আর গোছালী মানে বারুজীবী, অর্থাৎ বারুই। কোনো কোনো অঞ্চলে বলে যে এক সময়ে ওরা নাকি খড়ের গুচ্ছ বা গোছা দিয়ে ঘর-ছাওয়ানোর কাজ করতো তাই ওদের বলতো গোছালী, আবার অন্য অনেক অঞ্চলে বলে যে তা মোটেই নয়—ওরা পাণের গুচ্ছ বা গোছা বেঁধে বিক্রি করতো তাই ওদের বলা হ'ত গোছালী।'

'শিখবার জিনিস বটে!'—টিপ্পনি কাটে ভবেশ—'তা পুঁটুলীর ব্যাপারটা কী?'

'আরে পুঁটুলী মানে জানো না? পুঁটুলী হ'ল পোঁটলা বা পুঁটলি, আর তা থেকে পুঁটলি-বাঁধা গন্ধবণিক,—অর্থাৎ যারা পোঁটলা-পুঁটলির ভেতর মশ্‌লা টশ্‌লা গন্ধদ্রব্য রেখে তাই বিক্রি ক'রতো। ঐ নিশিকান্তর বাবার মুখেই তো আমরা শুনেছি যে পশ্চিম-ভারতের কোথাও কোথাও নাকি ওদেরই বল্‌তো গন্ধী, যেটাকে তোমরা এখন ইংরিজীতে করেছ গান্ধী—বা মহাত্মাগান্ধী!'

—ব'লে ভেঙ্‌চির সুরে শেষ শব্দটার ওপর একটু বেশী ক'রে-জোর দিলেন চক্কোত্তিমশাই।

আকণ্ঠভোজনের পর স্ফীত-পাকস্থলী নিয়ে এতখানি বাক্‌শক্তি ব্যয় ক'রে স্বভাবতঃই হাঁপিয়ে প'ড়লেন চক্কোত্তিমশাই। আর ও দিকে নিশিকান্তও ভিতরে ভিতরে কিছুটা অস্বস্তি বোধ ক'রছে তাঁর সমাজ-তত্ত্বের আলোচনা শুনে, সেটা বোধ করি বুঝতে পেরেই তিনি একটু দম নিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্তসুরে নিশিকান্তর দিকে ফিরে বললেন—

'দেখ, ভদ্দলোকদের সঙ্গেই যদি ছোটলোকদেরও খেতে বসান হয় তবে ভদ্দলোকরা খাবেই বা কী আর তাদের জাতজন্মই বা থাকবে কোথায়? যা পেট ও-ব্যাটাদের ওরাইতো সব মেরে দেবে আগে থাক্‌তে! তা' ছাড়া, কথায় বলে নাইয়ের কুকুর মাথায় চড়ে। তু'দিন পরে ঐ হাড়ী-বাউড়ী আর মেটে-বাগ্দীরাই মনে ক'রবে যে ওদেরই রাজত্ব হ'ল আর কি! বলি রায় মশায়ও কি এতে মত দিয়েছেন?'

'এতে আর অমতের কি কারণ থাকতে পারে জ্যাঠামশাই? তিনি নিজেই তো বলেন বৈষ্ণবের আদর্শ হ'ল তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা—এইসব। তবে আর নীচু জাত উঁচু জাত—'

'খুব যে বৈষ্ণব বৈষ্ণব করছো দেখতে পাচ্ছি!—' নিশিকান্তকে থামিয়ে দিয়ে বিদ্রূপ ক'রে ওঠেন চক্কোত্তিমশাই—'বলি বৈষ্ণবধর্মের জানই বা কী আর বোঝই বা কী? মহাপ্রভু স্বয়ং বর্ণাশ্রম মানতেন তা জান?——'

ব'লে আরো কি যোগ ক'রতে যাচ্ছিলেন তিনি, হঠাৎ একটা কান্নার শব্দে উপস্থিত তিনজনেই চম্‌কে উঠলেন। শব্দটা আসছিল কাঙ্গালীরা যেদিকে খেতে বসেছে সেদিক থেকে।

'আমি একটু দেখি জ্যাঠামশাই'—ব'লতে ব'লতে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল নিশিকান্ত অতিথ্‌শালার দিকে।

সেখানে, হট্টগোলের মাঝে, কান্নার শব্দকে অনুসরণ ক'রে এদিক ওদিক তাকাতেই দেখতে পেল নিশিকান্ত যে কিছু দূরে একজায়গায় একটি বছর এগারো-বারোর ছেলে অস্পষ্ট ভাষায় কীসব ব'লে হাউ হাউ ক'রে কাঁদছে—অজস্রধারে তরল পদার্থ নির্গত হচ্ছে তার চোখ-মুখ-নাক বেয়ে। আর তার চারদিকের লোকজন ততক্ষণে হাসির অট্টরোলে ভেঙে প'ড়েছে।

পাতা আর মানুষের সারির গোলকধাঁধাঁর ভিতর দিয়ে কোনো রকমে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল নিশিকান্ত ছেলেটিকে—

'খোকা, কী হয়েছে—কাঁদছ কেন?'

ছেলেটির পাশে-বসা বয়স্ক লোকটি—সম্ভবতঃ তার বাপই হবে—তার পিঠের উপর এক বিরাশী-দশআনা ওজনের চাপড় বসিয়ে দিয়ে বলে উঠল—

'ক্ষেতো—চুপ্‌কর্ বল্‌চি চুপ্‌কর্—দেখতে পাচ্চিস্‌না ছোটবাবু এয়েচেন!'

ফল কিন্তু হ'ল বিপরীত। ছেলেটি তার ঠাসাই-করা পেটের ওপর করুণভাবে হাত বুলোতে বুলোতে আরও তারস্বরে তার অন্তর্বেদনাটিকে ঘোষণা ক'রে উঠল নিশিকান্তর মুখের দিকে চেয়ে—

'অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ......ডাল আর শাগ্ দিয়ে ভাত খেয়েই আমার এম্‌নি প্যাট্ ভ'রে গেইচে যে আমি নুচি, বোঁদে, দৈ—এসব আর কিছু খেতে পাচ্চিনি গো......আমি কী কোরবো গো......অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ......'

নানারূপ কোলাহলের মধ্যেও কাঙ্গালীদের কথাবার্তা আর

অভিযোগাদি শুনে ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝতে পারল নিশিকান্ত। পরিবেষকের দল ভদ্রলোকদের দিকে বেশ ভালভাবেই পরিবেষণ ক'রে যাচ্ছিল বাধ্য হয়েই, কিন্তু এদিকটায় লক্ষ্য ক'রবার কেউ নেই দেখে বহুক্ষণ পর্যন্ত তারা কেবল ভাত, খানিকটা ক'রে শাক্-চচ্চড়ি, ডাল, আর ছ্যাঁচ্‌রা—এই পরিবেষণ ক'রেছিল। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—কাঙ্গালীরা তো আর জানে না যে কী কী বরাদ্দ আছে তাদের জন্যে, তাই কোনোরকমে শাক্-ডাল্-ভাত খাইয়ে তাদের পেট ভরিয়ে দিয়ে কেবল শেষের দিকে প্রত্যেকের পাতে এক-আধখানা ক'রে লুচি, এক কট্‌রা ক'রে জল-ঢালা দৈ, একমুঠো ক'রে ভুরো, আর দু'চার গণ্ডা ক'রে বোঁদে ফেলে দিয়ে বাকী সমস্ত ভালো ভালো খাবার তারা পাচার ক'রবে নিজের নিজের বাড়ীতে—ভাড়া-করা রাঁধুনী আর কর্মচারীদের সঙ্গে ভাগ ক'রে নিয়ে। কিন্তু রায়-বাড়ীতে ভোজ-খাওয়া ব্যাপারে অভিজ্ঞ প্রবীন হরিশ ডোম, ভুবন মেটে, ক্ষেন্তি বাগ্দি ও আরো জন কয়েক লোক ধৈর্যচ্যুত হয়ে একসঙ্গে চেঁচামেচি ক'রে ওঠার ফলে পরিবেষকের দল তাড়াতাড়ি কয়েক ধামা লুচি আর কিছু ভুরো, বোঁদে আর দৈ এনে কাঙ্গালীদের দিতে শুরু ক'রে দেয়।

'উঠে এস খোকা আমার সঙ্গে'—কোমল কণ্ঠে ছেলেটিকে ডাকল নিশিকান্ত। কান্না থামিয়ে তার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে একদৃষ্টিতে তাকায় ছেলেটি। এতক্ষণে ছেলেটিকে ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রল নিশিকান্ত। শ্যামলা মুখের ওপর দুটো সরল, অবোধ চোখ—তার কোলে—ময়লা গালে—টল্‌টল্ ক'রছে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা। পরণে মাত্র দশ-বারো ইঞ্চি চওড়া আর হাত দুয়েক লম্বা ময়লা কিট্‌কিটে এক টুক্‌রো ন্যাকড়া—তারই একটা কোণাকে আবার কাছার মত ক'রে নীচের দিকে ঘুরিয়ে

নিয়ে গিয়ে পিছনে টান ক'রে গুঁজেছে। এমন একটু আঁচল পর্যন্ত নেই যে তা দিয়ে চোখের জলটুকু মোছে।

'এস, আমি তোমাকে নতুন কাপড়ের খুঁটে ঐ সব ভালো খাবার বেঁধে দেবো—তুমি বাড়ী গিয়ে খেও'—বলে তাকে নিশিকান্ত। নিশিকান্তর মুখের দিকে·তাকিয়ে কী যেন লক্ষ্য করে ছেলেটি, তারপর পরম নির্ভরতায় আস্তে আস্তে উঠে এসে দাঁড়ায় তার পাশে।

ছু'জনে সেখান থেকে পা বাড়াতেই অনেকগুলি হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু এবার হঠাৎ ঈর্ষাক্লিষ্ট হ'য়ে ধাবিত হয় ওদের. দিকে, এদিকে-ওদিকে কয়েক জোড়া চোখের মধ্যে আবার বিদ্যুতেব মত এই ধরনের ইসারাও যেন একটা খেলে গেল—'বাঃ রে! ক্ষেতো ব্যাটাইতো জিতে গেল দেখ্ছি!'

ছয়

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা দিনটা। ঝোড়ো হাওয়া বইছে সারাক্ষণ—জানলার পর্দা কাঁপিয়ে ডেস্কের 'পরে খোলা বইয়ের পাতা উড়িয়ে। দরজায় ঝোলানো কমলা রঙের ওপর রূপোলী কাজ করা ভারী পর্দাটা দুলছে, দোলার সঙ্গে সঙ্গে রূপোলী জরি উঠ্‌ছে ঝিক্‌মিকিয়ে—চেয়ে চেয়ে দেখে বিভা। নীচু খাটের ওপর চাদর মুড়ি দিয়ে ব'সে ও পরীর সঙ্গে গল্প করে—খেইহারা সব বিচিত্র রকমের গল্প।

সমস্ত বাড়ীর মধ্যে এই ঘরখানিই শুধু বিভার একলা থাকার স্থান। এঘরে বড় একটা কেউ আসে না, তাই যখনই বিভার মন একটু বিরাম চায় এখানেই এসে বসে ও। সমস্ত সংসার থেকে এ যেন একটা বিচ্ছিন্ন জগৎ—চারদিক জুড়ে একটি গভীর নিরালা ভাব, একখানি নির্লিপ্ত শান্তি। হাল্কা সবুজ দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে একখানা বড় ছবি—সোনালী ফ্রেমে বাঁধাই করা—ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে বিপন্ন জাহাজের। একধারে দেখা যাচ্ছে পর্বতসমাকীর্ণ দ্বীপ, আরেক দিকে তরণীর নাবিকেরা লড়াই করছে ঢেউয়ের সঙ্গে, প্রাণপণ। সেই সংগ্রামের ভাবটি এত সুন্দর ফুটিয়েছে বিদেশী চিত্রকর যে ছবিখানার ওপর একবার চোখ প'ড়লে আর দৃষ্টি ফেরানো যায় না সহজে। দক্ষিণ দিকের দেয়ালে ভ্যান্‌-গগের একখানা ল্যাণ্ড্‌স্কেপ্‌। পল্লীচিত্রটি সবুজে-সোণায় কী যে সজীব, প্রাণবন্ত! তার একটু তফাতেই যে ছবিখানা সেটার দিকে চোখ পড়তেই মুহূর্তে বিভার মন চ'লে গেল অনেক দূরে। এছবি এঁকেছে বাইরের কোনো শিল্পী নয়—শঙ্কর......

বহুদিন হ'ল এ বাড়ীতে আর আসেনি শঙ্কর। সেই যে সেই ব্রেস্‌লেট্‌ নিয়ে গেল—তারপর থেকে আর কোনো খবরই নেই তার। কে জানে কোথায় কি ক'রছে এখন। হয়তো এই বাদলের দিনে এক হাঁটু কাদা ভেঙে ঘুরছে মাঠে মাঠে, নয়তো ঘিঞ্জি, নোংরা

জল্-দাঁড়ানো কোন্ বস্তির অন্ধকার মেটেঘরের ভ্যাপ্‌সা গন্ধের মধ্যে দিব্যি আসর জমিয়ে ব'সেছে যত কলকারখানার কুলী আর মজুরদের নিয়ে। কোথায় খাওয়া কোথায় শোওয়া কে জানে!

'তুমি কিচ্ছু শুনচোনা বৌদিমণি, আমি মিচিমিচিই ব'কে মরচি'—ক্ষুব্ধ পরী ব'লে ওঠে তার গল্প থামিয়ে।

'ঠিক্ শুনছি,—তুই ব'লে যা না'—বিভার চোখ ছবির দিকে। এতো সুন্দর আঁকতে পারে ছেলেটা!

'ক্যুও ভাদিস্' থেকে পেয়েছে ও দৃশ্যটার প্রেরণা, কিন্তু রেখায় রঙে, ভাবপরিস্ফুটনে—যে প্রতিভা আর বৈশিষ্ট্য সেটাতো ওর সম্পূর্ণ নিজস্ব। কী অনুপম যে শিশু-জীজাসের চোখ দুটি! বিশাল বিশাল মহীরুহের ছায়ামেলা নদীতীর, দূরে জলমান রোমের সর্পিল ধূমাগ্নিরেখা আবছা দেখা যায়। নীরোর অত্যাচোরভীত পলায়নরত পিটার নির্জন নদীতীর ধ'রে চ'লেছেন—বিলাসপাপমগ্ন রোমে তাঁর অসমাপ্ত কর্মকে ফেলে রেখে তিনি আজ হয়েছেন অনিশ্চিতের যাত্রী। বনপথের ছায়ায় ছায়ায় তিনি চলেছেন, হঠাৎ পথে দেখা—শিশু-জীজাস্! টাইবারের দূরগামী রূপোলী জলস্রোতের স্তব্ধ নির্জন পারে, বিপুলবিটপিঘন অরণ্যাণীর বিষণ্ণম্লান অন্ধকারে—এ কী জ্যোতির্ময় আবির্ভাব! বিহ্বল পিটারের মুখ দিয়ে শুধু বার হল—'একি প্রভু, তুমি! কোথায় যাও?' বৃদ্ধ, ক্লিষ্ট পিটারের দিকে দুই স্নিগ্ধ-জ্যোতির্ময় আঁখি মেলে শিশু তার অপরূপ করুণাপ্লুত কণ্ঠে উত্তর দিলে—'টু বি ক্রুসিফায়েড্ এগেইন্!' —আবার ক্রুশে বিদ্ধ হ'তে! টাইবারের অবিরাম তরঙ্গোচ্ছ্বাসে, শ্যামল বনানীর স্তব্ধ নীরবতায়, শুধু একই সুর ধ্বনিত হতে থাকে বিমূঢ় পিটারের সমস্ত চেতনাকে ঘিরে—টু বি ক্রুসিফায়েড্ এগেইন্! ঐ যে শিশু জীজাস্ চোখ মেলে চেয়ে আছে পিটারের অপলক চোখের দিকে—যেন ভক্তশিষ্যের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখছে, আর ভক্তের সমস্ত সত্তা আস্তে

আস্তে দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে জীজাসের মহিমায়—শরণাগত পিটার সর্বস্ব দান করে রিক্ত হয়ে যাচ্ছেন……। ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে বিভার চোখে কেন জানি জল ভ'রে এল। গুন্ গুন্ করে একটি গানের কলি আপনি এসে গেল ওর গলায়—

'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি……'

'তুমি কিচুই শুন্‌চোনা বৌদিমণি!'—ব'লে ফেলে পরী এবার একটু রুক্ষ স্বরেই—'বলতো কি হ'ল ঐ হারানীর সোয়ামীর?'

অভিযোগ তার মিথ্যে নয়। বিভা ওকে তুষ্ট করবার জন্যে বলে—

'অন্য কিছু গল্প বল্ পরী, ওসব ঝগড়াঝাঁটির কথা শুনলে আমার ভারী মন খারাপ হয়ে যায়। বেশ একটা কোথাও বেড়াতে টেরাতে যাওয়ার গল্প বল্ না শুনি!'

'বেড়াতে আর আমরা কোন্ চুলোয় যাবো বৌদিমণি? আমরা হলাম গরীব মানুষ। জম্মের মধ্যি সেই কেবল একবার গেচি সিজলকাটি—হীরুর বাবার সাথে রূপনারাণের ওপর দিয়ে নৌকো ক'রে। সেখেনে ওর মামার বাড়ী।'

'আচ্ছা সেই গল্পই বল্, আমারতো তাও ঘটবে না এ জীবনে!'—বলে বিভা—'তুই বলছিস্ গরীব বলে তোর যাওয়া হয়নি। কিন্তু আমার শ্বশুরের তো টাকা আছে, তবু কেন যাওয়া হয় না বল্ দেখি? এ বাড়ী ছেড়ে ওঁরাও নড়বেন না, কাউকে নড়তেও দেবেন না। আসলে ওঁরা বুঝতেই পারেন না বাইরে বেরুবার প্রয়োজন কী! জীবনে একবার মথুরা-বৃন্দাবন ঘুরে এসেছেন, ব্যস্—হয়ে গেছে। আর ওসব কথা নয় ছেড়েই দিলুম, দূরদেশে বেড়াতে যাবার কথা এখন আমি বলছিনে। ঐ তোদের শালবুনীর জঙ্গলে কি রূপনারায়ণের ওদিকে একটু বেড়াতে যাব, সেও হবে না। বলবে—ভদ্রলোকের বৌ টো টো করে সাতরাজ্যি

ঘুরে বেড়াবে কি ? বৌমানুষ অমন মাঠে-ঘাটে বেড়ালে রায়বংশের মর্যাদা-হানি হবে ! এ কী অদ্ভুত বিচার এদের—এর আমি কিছু কূল কিনারা ক'রতে পারিনে পরী। তোর টাকা নেই কিন্তু স্বাধীনতা আছে—পদে পদে তোকে বিশ্বশুদ্ধ লোকের মতামতের কথা ভেবে চল্‌তে হয় না, কখন পাণ থেকে চূণ খস্‌ল সেই ভয়ে সর্বক্ষণ তটস্থ থাকতে হয় না। তুই যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াতে পারিস্——'

'তা সত্যি বৌদিমণি !'—ব'লে ওঠে পরী ঘাড় নেড়ে বিভার কথা শেষ না হ'তেই—মুখে তার একটা আবিষ্কারের আনন্দ আর বিস্ময় ফুটে ওঠে একসঙ্গে। তারপর একটু ভেবে নিয়ে আবার বলে—

'কিন্তু ত্যাকো, যারা রোজ রোজ হেতা-হোতা ঘুরে বেড়ায় তাদের কি আর ভালো নাগে ওসব ! তা'ছাড়া, সাবাদিন ঘরের খাটনি পরের খাট্‌নি—এসব খেটে আর বেড়াবোই বা ককোন্ ? আমাদের তো মনে হয় তোমরা কেমন রাজার হালেই আচো—কাজকম্ম কিচু ক'ত্তে হয়না, যা চাও হাতের কাচেই পাও, সোয়ামী কি শাশুড়ী মারধোর করেনা, মাজ্ রেতে ঘর থেকে বা'র করেও দেয়না——কতো আদোর-ভালোবাসা তোমাদের,—যেতাই যাও গাড়ীঘোড়া নোক-নস্কর সঙ্গে যায়, গয়নাগাঁটি জামাকাপড়—এসবের কিচুরইতো আবাব্ নাই তোমাদের !'

'যদি তুই আমার অবস্থায় পড়্‌তিস্, পরী, তো বুঝ্‌তে পারতিস্ এসব জিনিস আশীর্বাদ নয়—অভিশাপ। গওনার্গাটি, জামাকাপড়, বাড়ী গাড়ী—এতেই কি মানুষের সুখশান্তি বা আনন্দ আছে ব'লে তুই মনে করিস ?'

পরী চুপ ক'রে থাকে—বিভার মনের অবস্থাটা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারেনা। গেঁয়ো, অশিক্ষিতা, গরীবের মেয়ে সে—তুর্ভিক্ষের সময়ে

না খেতে পেয়ে পাগল হয়ে গিয়েছিল। সারাটা বর্ষাকাল চাল ফুটো হয়ে ঘরে জল পড়ে, রাতের পর রাত ব'সে কাটাতে হয় তাকে। সে কেমন ক'রে বুঝ্‌বে টাকা বাড়ী গাড়ী ঐশ্বর্যের অসারতা? সে জানে টাকা যার হাতে দুনিয়াটাও তারই হাতে—যখন যা খুসি ক'রতে পারে সে। তাই বিভার এইসব দার্শনিক উক্তির তাৎপর্য কোনোমতেই মাথায় ঢোকেনা পরীর।

'জানিস!'—বিষণ্ণ কণ্ঠে ব'লে যায় বিভা—'এযেন রাজবাড়ীতে পোষা তোতাপাখীর জীবন। সোণার জালিকাটা খাঁচা, সোণার দাঁড়—রকমারি খাবার আস্‌ছে দিনরাত, বাড়ীর লোক বাইরেব লোক নিত্য আস্‌ছে তাকে আদর ক'রতে। কিন্তু একবার পাখী খাঁচা ছেড়ে বেরুবার জন্যে ঝট্‌পট্‌ ক'রেছে কি চারদিক থেকে লোকজন ছুটে আসে হাঁ হাঁ ক'রে—পাছে সে উড়ে পালায়। তা সে পাখীর বুকের ব্যথা কে বোঝে বল? তুই যতই তাকে আদর-যত্ন কর্‌ না কেন সেসব যে কত মিথ্যে তা কি তখনি ধরা পড়েনা যখন প্রাণান্তেও সে একবার নীল আকাশে উড়ে বেড়াবার স্বাধীনতা পায়না? আর তাই পাখী যখন একবার কোনওক্রমে বাইরে যেতে পারে আর সে ফিরে আসতে চায়না কিছুতেই। তবেই দেখ্‌, সামান্য বনের পাখী সেও বোঝে যে আদর আর ভালোবাসা এক জিনিস নয়। যারা পাখী পোষে তারাও যেমন বিশ্বাস করেনা তাদের পাখীকে, পাখীও তেম্‌নি বিশ্বাস করে না তাদেরকে। তাই অমন নিশ্চিন্ত আরাম ছেড়েও পাখী কেবলই উড়ে পালাতে চায় নীল আকাশে—তাতে তার অনাহারে কি ঝড়ঝঞ্ঝায় মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে তবুও।'

পরী খাটের একটা পায়ায় ঠেস্‌ দিয়ে চুপ্‌ ক'রে বসেছিল খুব মনোযোগ দিয়েই—তবে সে মনোযোগটা বিভার কথা শোনা কি

না-শোনার দিকে তা ঠিক্ বলা যায় না—এবার দু'হাত তুলে গা'মোড়া ভেঙে একটা হাই তুল্‌লে—বিভার অলক্ষ্যে।

বিভা আপন মনেই ব'লে চলে—

'জানিস্ পরী, সেদিন ওর কাছে বললুম যে আমি একটা ফ্রী অ্যাডাল্ট্ স্কুল্ খুলতে চাই—মানে বড়দের স্কুল্,—চাষীরা আর চাষী বৌরা এসে প'ড়বে। শুনে খানিকক্ষণ চুপ্ ক'রে থেকে তারপর বলে কি—এ হ'তে পারেনা, লোকে ব'লবে কি? আর আমার তো নাইট-স্কুল রয়েছেই!—কিন্তু আমার তো আর লেখাপড়া শেখানোটাই আসল উদ্দেশ্য নয়—চাষীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসাটাই আমার লক্ষ্য। তাদের অ-আ-ক-খ শেখার দরকার নেই তা আমি বলিনে কিন্তু তার চাইতেও দরকারী শিক্ষা আমি ওদের দিতে চাই। কিন্তু কেউতো আমার মনের কথা বোঝেনা পরী, এমনকি নিজের স্বামী পর্যন্ত——'

চট্ ক'রে পরী এবার বিভার দিকে মুখ ফেরাতেই খাট্‌টা একটু কট্ শব্দ ক'রে ওঠে। বিভা লজ্জিত হ'য়ে পড়ে। সত্যিইতো, বড় বেশীরকমের আল্‌গা কথা ব'লে ফেলতে যাচ্ছিল সে! নিজের অপ্রতিভ ভাবটাকে চাপা দেবার জন্যে সে সুর ফিরিয়ে বলে ওঠে—'আচ্ছা পরী, চাট্টি কাঁটালবীচ্ পুড়িয়ে আন্‌তে পারিস্—বড় খেতে ইচ্ছে করছে।'

'খুব পারি বৌদিমণি'—পুলকিত হ'য়ে পরী এবার ঝাড়াঝুড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়ায় মেঝের উপর, আর দেখতে-না-দেখতে ঘরের বা'র হ'য়ে পিছন দিকের সিঁড়ী বেয়ে তর্‌তর্ ক'রে নেমে গিয়ে রায়বাড়ীর টালির চাল ওয়ালা মুড়ী-ভাজ্‌নীর ঘরটার দিকে ছোটে।

পরী চ'লে গেলে বিভা নিজের মনে আলোচনা ক'রতে বস্‌ল। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব যেন কেমন ওলট্-পালট্ হ'য়ে গেছে ওর—ভাবতে গিয়ে বিভার মন থৈ পায়না। মুক্ত স্বচ্ছন্দ

আদর্শময় একটা জীবন—এ তো চিরদিনই কাম্য ছিল ওর। কৈশোরের প্রথম উন্মেষকাল থেকে ওর ভাবুক মন চেয়েছিল স্বাধীন, মুক্ত, প্রেরণাময় উদ্দাম জীবনের স্বাদ, চেয়েছিল বাঁচার মত বাঁচতে—দৈনন্দিন বৈচিত্র্যহীন জীবনের গ্লানি ব'য়ে বেড়াতে ওর হৃদয় চিরদিনই বিদ্রোহ ক'রেছিল। কিন্তু সমাজ-সংসাবের কোথাও কোনোখান থেকে সাড়া না পেয়ে ওর মনটা ক্রমেই নিজেকে সবকিছুর সাথে মানিয়ে নেবার মুখে চ'লেছিল—বিশেষ বিয়ের পর থেকে। অবশ্য এটা ঠিক যে বিয়ের আগে সে অনেক স্বপ্নই দেখেছিল নিশিকান্তকেই কেন্দ্র ক'রে। ভেবেছিল ওব বুকের অনেক সঞ্চিত আশা সার্থক হবে—নিশিকান্ত হ'তে পারবে ওর যাত্রাপথেব সাথী—ওর জীবনতরীর কর্ণধার। কিন্তু বিয়ের পর শ্বশুববাড়ী এসেই ওর ভুল ভেঙ্গে গেল। অথচ ফিরবার পথ গিয়েছে তখন বন্ধ হ'য়ে। নিশিকান্ত ওর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে একেবাবে ওতপ্রোতভাবে। এতবড় বন্ধনের মুখোমুখী ও আর কখনো হয়নি জীবনে। এখন নিশিকান্তকে বাদ দিয়ে জীবনের কথা ভাবাও যে অসম্ভব! কাজেই সমাজ-সংসারের সঙ্গে আপোষ করা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না তার।—হঠাৎ শঙ্কর এল একদিন কোথা থেকে ধূমকেতুর মত, কালবৈশাখীর খ্যাপা বাতাসেব মত—ওর সমস্ত ভাবনারাশিকে একেবারে ভেঙে চুরে তছনছ ক'রে দিয়ে গেল। শঙ্কর এসে বললে—বাঁচতে হবে। শূয়োরের মত পেট পুরে খাওয়া আর নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোনো—এরকম বাঁচা নয়। কর্মের মধ্যে—ত্যাগের মধ্যে—এগিয়ে চলার মধ্যে—বাঁচতে হবে। শুধু ভুয়ো শব্দের ছন্দ নয়, কীভাবে ও কাজ করতে পারে তার সুস্পষ্ট রূপ তুলে ধরেছে শঙ্কর ওর সামনে। এমন রূঢ় নিষ্ঠুর কঠোর আলোয় ফেলে জীবনের আদর্শকে কোনদিন বিচার করেনি বিভা। কৈশোরে—যৌবনের প্রথমে—সে ছিল স্বপ্নদর্শী। আবেগ

ছিল—নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না, প্রাণের উন্মাদনা ছিল—কিন্তু ওর কর্মের ধারা কী হতে পারে তার রূপ ছিল না স্পষ্ট। এ সংসারের সঙ্গে সে যে আপোষের মুখে চলেছিল তারও একটা কারণ এই। ও যে নিজেই জানতো না নিজেকে!

সমস্ত আড়াল আবডাল ভেঙে শঙ্কর এসে দাঁড়ালো। এ বাড়ীর সমস্ত পারিপার্শ্বিক আর আবহাওয়ার মধ্যে সম্পূর্ণ বেমানান, খাপছাড়া। শঙ্করের সমস্ত কথা, সমস্ত ব্যক্তিত্বই যেন একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ্—একটা প্রচণ্ড আহ্বান। ও যখন কথা বলে, বিভার মনে হয় সমস্ত সমাজ-সংসারের এই বিরাট লৌহ প্রাচীরটা যেন ভেঙে খান্‌খান্ হয়ে পড়ছে! দুর্গম অরণ্য, দুস্তর সমুদ্র, দুর্লঙ্ঘ্য হিমাদ্রিও তো পারবে না শঙ্করের গতিরোধ করতে! ছেলেবেলায় বহুবার-গাওয়া একটা গান মনে পড়ে বিভার :—

ন্যায় বিরাজিত যাদের করে
বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে
সত্যের নাহি পরাজয়।

সত্যের নাহি পরাজয়! একদিকে নিশিকান্ত—সমস্ত সংসার—তাকে টানছে, বাঁধছে আষ্টেপৃষ্ঠে পাকে পাকে, নাড়ীতে নাড়ীতে। আরেকদিকে—ঘন তমসাবৃত রজনীর বুক চিরে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে—উন্মাদ ঝোড়ো হাওয়া ছুটেছে অট্টহাস্য ক'রে—বিক্ষুব্ধ সমুদ্র বজ্র-নির্ঘোষে উত্তাল উদ্দাম। আর সাগরের সেই বিপুলনিনাদী তরঙ্গোচ্ছ্বাসের বুকে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ তরণীর 'পরে শঙ্কর হাল ধ'রে আছে—সমস্ত প্রকৃতি—সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করছে। এ কী মৃত্যুফেনিল সংগ্রাম! শঙ্কর যেন ডাকছে—তার দূরাগত কণ্ঠকে বারবার ডুবিয়ে দিতে চাইছে অন্ধপ্রকৃতির উন্মত্ত হাহাকার—বলছে—'এস, ঝাঁপ দাও, মরতে হয় তো এইখানে এসে মর।

দৈনন্দিন সংসারের মরা জন্তুর স্তূপের তলায় জীবন্মৃত হয়ে বেঁচো না……'

ওইখানে ওই মরণলীলায় ঝাঁপিয়ে পড়বে বিভা? সে শক্তি তার কই? সে যে একটা সামান্য মেয়ে মাত্র, অসহায়, দুর্বল, ভীরু

সাত

বলো হরি হরি বোল্, বলো হরি হরি বোল্……

'কোন্ বাড়ীরে নীতা, দেখতো'—মুহূর্তের জন্যে দুই চোখ খুলেই আবার বন্ধ করলে শঙ্কর।

'যে বাড়ীই হোক্ না, তোমাকে এ অবস্থায় যেতে দোব না জেনে রাখো। এই ভোর রাতেও তিন ডিগ্রী জ্বর ছিল, গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছিল। এখন একটু যেই কমেছে…ওসব চলবে না। কোনো রকম উত্তেজনা চলবে না আমি বলে দিচ্ছি, একেবারে শান্ত হয়ে চুপটি করে থাকো। দাঁড়াও আমি গান দিই, তুমি শোনো।'

ভাইয়ের পাশ থেকে উঠে নীতা ওদের বহু পুরাণো গ্রামোফোন্টার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। একপাশে কতকগুলো রেকর্ড পড়ে আছে, তার ওপর ধুলো জমেছে……।। রাস্তার ধারের ঘর, সবসময় ধুলো আসে। একখানা রেকর্ড তুলে নিল নীতা, শঙ্করের প্রিয় গান—'সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে……।' গ্রামোফোনে দম দিতে দিতে একবার চেয়ে দেখলে নীতা শঙ্কর চেয়ে আছে ওর দিকে, চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল।

'সার্থক জনম আমার—দিচ্ছি' বলে সে সস্নেহ-দৃষ্টিতে ভাইয়ের দিকে চাইলে।

'কী খাবে দাদা? নোন্তা বিস্কুট আর চা?'

সুবোধ শিশুর মত ঘাড় নাড়ল শঙ্কর। নীতা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালো, চায়ের জল চড়িয়ে দিতে।

রেকর্ডে গান চলেছে—কোন্ বনেতে জানিনে ফুল, গন্ধে এমন করে আকুল, কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে……। চোখ বুজে একমনে শুনছিল শঙ্কর। হঠাৎ খুট্ ক'রে একটু শব্দ হতেই সে চোখ মেলে চাইলো। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছে পাশের বাড়ীর উমা।

'নীতা কোথায়, বাড়ী নেই?' অপ্রতিভের মত জিজ্ঞেস করে উমা।

'রান্নাঘরে আছে।' ব'লে শঙ্কর চেয়ে থাকে ওর দিকে, সে দৃষ্টিতে কেমন একটা শূন্যতা।

উমা পাশের বাড়ীর মেয়ে, ছেলেবেলা থেকে নীতার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা, একসঙ্গে খেলেছে, একসঙ্গে পড়েছে। ছেলেবেলায় শঙ্করের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু বড় হওয়ার পর সেটা আর নেই। নিতান্ত প্রয়োজনীয় দু-একটা কথা ছাড়া আর কোনো কথা ওদের মধ্যে হয় কিনা সন্দেহ। আর শঙ্কর কতটুকু সময়ের জন্যেই বা বাড়ী আসে!—তবু ছেলেবেলার সেই বন্ধুত্বের রেশ এখনো রয়ে গেছে ওদের মনে। তাই পরস্পর কথা বলতে গিয়ে এমন অবস্থা উপস্থিত হয় ওদের,—না পারে ওরা 'আপনি' বলে সম্ভাষণ করতে, না পারে 'তুমি' বলতে। নিছক লৌকিকতা করাও ওদের পক্ষে যেমন দুরূহ, ঘনিষ্ঠ আন্তরিকতা দেখানও তো প্রায় তেমনই কঠিন। আজ ওদের মধ্যে এতখানি দূরত্ব—সে দূরত্ব স্থানের, কালের, মনের। ওরা তো একসঙ্গে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়নি, শৈশব থেকে যৌবন—এর মধ্যে এমন একটা প্রচণ্ড গতি হঠাৎ এসে গেল শঙ্করের জীবনে,—উমার জীবন থেকে তার পথ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, সে গতির পদে পদে যে সংগ্রামের সুর ঝঙ্কৃত হয় তার অর্থ উমার কাছে দুর্বোধ্য। আজ—দুজনে তাকিয়ে দেখে—শুধু দুস্তর ব্যবধান!

'নীতা এখুনি আসবে...'বলে শঙ্কর চুপ ক'রে যায়। বসতে বলার কথাটা ওর মনে হয় কিন্তু আবার সেই সম্বোধনের প্রশ্ন একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ভদ্রতার অপেক্ষা রাখে না উমা। শঙ্করের অপ্রস্তুত মুখের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করেই সে ঘরের ভেতর এসে বসে। রেকর্ডে গান ততক্ষণে থেমে গেছে। ঘরের মেয়ের

মতই এ বাড়ীর জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করে উমা, ছোটবেলা থেকে এ বাড়ীর সর্বত্র তার অবাধ অধিকার। বাছ্‌তে বাছ্‌তে বহুদিনের পুরাণো একখানা রেকর্ড চোখে পড়ে যায় উমার, সেখানা তুলে নিয়ে চালিয়ে দেয় গ্রামোফোন্‌টা।

আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান
তার বদলে আমি চাইনি কোনো দান⋯

শুনতে শুনতে উমা চেয়ে দেখে শঙ্কর চোখ বুজে শুয়ে রয়েছে। ওর শান্ত সমাহিত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে উমা—থাকতে থাকতে ওর মন ডুবে যায় ভাবনার গভীরে। মনে পড়ে ছেলেবেলায় একবার ওর খুব অসুখ করেছিল, শঙ্কর তখন সারাদিন ব'সে থাকত ওর পাশে, নানারকম গল্প ব'লে ভুলিয়ে রাখতে চাইত, কাছ-ছাড়া হ'ত না কোনো সময়। সেই শঙ্কর কেন এমন হয়ে গেল? যে লোক দেশকে এমন করে ভালোবাসতে পারে সে কী করে পাশের মানুষের প্রতি এত উদাসীন হতে পারে? পাশের বস্তির ওই জয়রাম মেথরের পুংখানুপুংখ খবর ওর নখদর্পণে,—কিন্তু উমা মরল কি বাঁচল সে খবরও রাখা প্রয়োজন বিবেচনা করে না শঙ্কর। আর সকলের সুখদুঃখই সত্য শঙ্করের কাছে, শুধু উমার সুখদুঃখই একেবারে ভূয়ো—অর্থহীন। দেশ, দেশ,—দেশ কী দেবে শঙ্করকে? যদি ও আজ পথের ওপর মরে না খেতে পেয়ে, দেশ কি ওর জন্যে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে? যদি দুর্যোগের রাত্রে রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে খোলা রাস্তার ধারে, কেউ কি ওকে তুলে এনে আশ্রয় দেবে, করবে শুশ্রূষা? কিন্তু সেই তারাই—যাদের হৃদয়ে নেই একফোঁটা ভালোবাসা, লেশমাত্র কৃতজ্ঞতাবোধ—তারাই শঙ্করের কাছে আপনার জন। আর যারা তার আন্তরিক হিতৈষী—যাদের জীবনমরণ নির্ভর করছে তার একটুখানি চোখের দৃষ্টি, একটুখানি মুখের কথার ওপর—তারা শঙ্করের কাছে সম্পূর্ণ অস্তিত্ববিহীন।

……এই তো সেদিন—খুব বেশী হলেও বছর দুইয়ের বেশী নয়—শঙ্কর যেদিন কলকাতায় হঠাৎ এল ডবল্ নিউমোনিয়া নিয়ে,—নীতা তখন এখানে ছিল না,—এই একলা-বাড়ীতে দিনের পর দিন রাতের পব রাত কী অমানুষিক পরিশ্রম আর দুশ্চিন্তার ঝড় বয়ে গেছে উমার একার ওপর দিয়ে—সে শুধু জানে সে নিজে, আর যদি অন্তর্যামী কেউ থাকেন তিনি। ……কিন্তু তবু কি শঙ্কর বোঝে না উমার মনের কথা? যদি নাই বোঝে, স্বাভাবিক স্নেহদয়ামায়ার পরিচয়ও তো পাওয়া যায় না উমার সঙ্গে ওর ব্যবহারে—যা কিনা শঙ্কর রাস্তার লোককেও দান ক'রে থাকে অকাতরে।

'…এইটুকু মোর রইল অভিমান—
ভুলতে সে কি পার, ভুলিয়েছ মোর প্রাণ…'

গানের শেষ কলিটি বারেবারে এসে আঘাত করে উমার বুকে·—'ভুলতে সে কি পার, ভুলিয়েছ মোর প্রাণ!' শঙ্করকে উমা সেবা করেছে, ভালোবেসেছে, শ্রদ্ধা করেছে, কিন্তু সে নিয়ে কোনও গর্ব, কোনও অভিমান রাখতে চায় না উমা। তার ব্যথা এইখানে যে শঙ্কর তো একদিন তাকে ভালোবেসেছিল…। হোক্ সে শৈশবের ভালোবাসা, তবু তো সে মেকি বা মিথ্যে নয়। সে ভালোবাসার স্মৃতিমাত্রও কি আজ নেই শঙ্করের মনে?…

'উমা কখন এলি?'—বলতে বলতে ঘরে ঢোকে নীতা। কিন্তু বান্ধবীর মুখের দিকে চোখ পড়তেই বিস্মিত হয়ে যায় নীতা—'কী হল?'

কী করে ওর ভিজে চোখ দুটো লুকোবে উমা ভেবে পায় না। ওদিকে শঙ্করও ততক্ষণে চোখ মেলে চেয়ে আছে, নীতার বিস্মিত কণ্ঠ শুনে। নীতা ভাবে শঙ্কর বুঝি উমাকে কোন কটু কথা বলেছে, তাই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ভাইয়ের দিকে তাকায়। কিন্তু শঙ্করের দৃষ্টিতেও শুধু বিস্ময় আর জিজ্ঞাসা। উমা ভারী লজ্জিত বোধ করে,

তাই লজ্জাটাকে চাপা দিতে তাড়াতাড়ি অন্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করে—

'কাল ও বাড়ী যাস্‌নি কেন? আমি এই আসছে এই আসছে করে রাত ন'টা অব্‌ধি বসে রইলুম, তারপর ভাবলুম অন্য কোথাও গেছিস্‌...'

'এই তো দেখ্‌না দাদা কাল দুপুরবেলা হঠাৎ কোত্থেকে এল, একপা ধুলো, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, চোখ দুটো লাল, গায়ে হাত দিয়ে দেখি আগুন বা'র হচ্ছে...। এই তো আজ সকালবেলা সবে জ্বরটা একটু কমেছে, কাল তো বেহুঁস হয়ে ছিল প্রায়...'

'আজকের দিনটা আমি তোদের বাড়ী থেকে যাবো নীতা?—কাজের সুবিধে হয় যদি তোর—'

এমন উমা অনেক সময়েই থাকে, নীতাও দরকার বা ইচ্ছে হলে থেকেছে ওদের বাড়ী। ওদের বন্ধুত্বের মাঝে লৌকিকতার স্থান নেই।

'তোর মার অসুবিধে হবে না তো?'

'অসুবিধে কিসের? কমলা আছে—যতীন্ আছে, তেমন কিছু দরকার হলে ডেকে পাঠাবে....'

'তবে থাক্, আমার তো খুব ভালোই হয়!'

রান্না-ঘর থেকে তিনজনের জন্যে চা আর নোন্‌তা বিস্কুট্ নিয়ে এল নীতা। খেতে খেতে দুই বন্ধুতে গল্প করে। শঙ্করের গল্প করতে ভালোবাসে নীতা, সে গল্পের সবচাইতে রসিক শ্রোতা উমা।

'এমন পাগলা উড়ুটে ছেলে ত্রিভুবন খুঁজলে মেলে না।'—বলে নীতা। উমা হাসে। দুজনেই একবার আড়চোখে চায় ওদিকে,—শঙ্কর ওপরদিকে চেয়ে কড়িকাঠ গুণছে।

'আচ্ছা বল্‌তো উমা, নিজে আগে বাঁচলে তারপরে তো পরকে

বাঁচাবে। একেবারে সেই শেষ অবস্থা হলে তখন বাড়ী আসবে, আবার দেখবি ভালো হতে না হতেই উধাও!'

'সে তো বটেই, নিজের শরীর সবচেয়ে আগে।' বলে উমা।

'দাদা, ও দাদা, দেখছ, উমাও বলছে ওই কথা। আমার মতেই ওরও মত।' ইচ্ছে করেই নীতা চেষ্টা করে কথার মধ্যে দিয়ে ছুজনের মধ্যেকার প্রাচীরটাকে ভেঙে ফেলতে। কিন্তু শঙ্করের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায় না। ছাদের দিকে চেয়ে কী এক গভীর চিন্তায় মগ্ন রয়েছে সে।

'দাদা, এই দাদা, এতো ধ্যান নাই করলে! রাতদিন তো ছাইপাঁশ ভাবছ যত, এখন একটু কথা বলো, মনটা হাল্কা হবে। আর'—নীতা একটু ইতস্ততঃ করে বলেই ফেলে—'এই যে উমা এসেছে, অন্ততঃ ভদ্রতার জন্যেও তো ওর সঙ্গে দুটো কথা বলা তোমার উচিত। অন্ততঃ কৃতজ্ঞতাবোধেও তো……সেবার অসুখে ও তোমার যা করেছিল!—'

'আমি সেজন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞ'—উমার দিকে তাকিয়ে শঙ্কর বলে—'সে ঋণ শোধ করার ক্ষমতা আমার নেই……'

উমার চোখ ফেটে জল আসে। কে চায় কৃতজ্ঞতা? ঋণের কথা কি বলেছে উমা কোনওদিন? সে শুধু চেয়েছিল একটুখানি করুণা, একটুখানি স্নেহ। সেতো ভিখারিনী, শঙ্করকে দেবার মত কী আছে তার? যদি থাকতো তবে তো তারই বলে শঙ্করকে সে জয় করে নিতে পারতো…

উমাকে সান্ত্বনা দেবার কোনো ভাষা খুঁজে পায় না নীতা। শঙ্করের দিকে চেয়ে ব্যথাভরা কণ্ঠে ও বলে—'আচ্ছা দাদা, তুমি যাদের ভালবাসো তারা কি তোমায় ভালোবাসে? যখন তাদের নিজেদের স্বার্থে ঘা পড়ে তখন তারা দাদাবাবুর খোঁজ করে, কিন্তু

এম্‌নিতে—কই, আপদে-বিপদে কখনও তো দেখিনে একবার উঁকি মেরে পর্যন্ত খোঁজ নিতে ?—'

'কাদের কথা বলছিস্ নীতা, আমি তো কাউকেই ভালবাসতে পারিনি জীবনে। এত বড় দেশটায় লক্ষ লক্ষ মানুষের লক্ষ শত দুঃখ, আমি তার কী খোঁজ রাখি বল্ ?' ব'লে ম্লান একটু হাস্‌ল শঙ্কর।

'জানতুম তুমি কী উত্তর দেবে।'—রাগতকণ্ঠে নীতা বলে—'কিন্তু একটা কথার জবাব দিতে পার, ওই লোকগুলো তোমার শত্রুতা করে কেন ? উপকার নয় নাই করল্, কিন্তু খুন করার চেষ্টা পর্যন্ত করেছিল একবার তোমার উপর চটে গিয়ে, মনে আছে ? তোমার যদি একটুও লজ্জাবোধ থাকত, তবে তুমি আর ওদের হয়ে ওকালতি করতে না!'

'নীতু, তুই তো জানিস্‌নে ভাই'—গভীর ব্যথাভরা কণ্ঠে শঙ্কর বলে—'কী দুঃসহ লজ্জা আর গ্লানির বোঝা আমি সেইদিন থেকে বয়ে বেড়াচ্ছি। ওরা যে আমারই জাতভাই, ওরা তো পর নয়, এক রক্ত, এক মাটি জল হাওয়ায় মানুষ, ওদের জীবনের যা কিছু মালিন্য সে সবই যে আমাকে এসে লাগে, তাকে ঢাকার চেষ্টা না ক'রে কী ক'রে পারি বল্ ? ভেবে দেখ্ নীতু, আজ যদি আমি বিপথে নামি—ষড়যন্ত্র ক'রে বেড়াই মানুষের আত্মার বিরুদ্ধে—তার সমস্ত লজ্জা আর অপমানের কালি কি তোর গায়েও লাগবে না ? পারবি তুই তাকে অস্বীকার করতে ? তখন দেখবি তুইই ঢেকে বেড়াবি আমার কলঙ্ক!—নাকি ঢাক পিটিয়ে প্রচার ক'রে বেড়াবি ?—আমাকে সত্যিকারের জবাব দে।'

'দেখো দাদা, সত্যি কথা যদি বলতে হয়তো বলব পাপীর পাপ ঢাকা কখনোই ভালো কাজ হতে পারে না!'—একগুঁয়ে সুরে নীতা বলে—'তবে তোমার আমার কথা তুলো না।

যেখানে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক সেখানে উচিত-অনুচিত ভেসে যায়…'

'দেশের সঙ্গে বুঝি গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক নয়?'

'স্বভাবতঃ নয়। ও তোমার জোর ক'রে তৈরী করা।'

'কখ্‌খনো না। মা-বাবার সঙ্গে যে রকম সম্পর্ক, দেশের সঙ্গেও ঠিক সেই রকম সম্পর্ক। আমরা ভারতবর্ষের লোক যদি একটা অস্বাভাবিক জীবন বহুদিন ধরে চালিয়ে এসে থাকি তবে শুধু সেই কারণেই দেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা মিথ্যে হয়ে যেতে পারে না। আর যে কোনো দেশের দিকে তুই চেয়ে দেখ্, দেশাত্ম-বোধের এমন অভাব আর কোথাও নেই। তুই যদি আজ ভারতের মেয়ে না হয়ে চীন, জাপান কি রাশিয়ার মেয়ে হতিস্ তবে কখনো ওকথা মুখেও আনতে পারতিস্‌নে যে দেশের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক সে জোর করে তৈরী করা—স্বাভাবিক সত্য নয়। জানিস্ নীতা, আদর্শ ভাব প্রেরণা—এসব বড় বড় কথা থাক্, কিন্তু একটা খুব খাঁটি কথা তোকে বলি—একেবারে বাস্তব সংসারের প্রয়োজনের কথা। ধর্, আজ তোর ইচ্ছে করল পৃথিবীর যে কোনও একটা দেশে গিয়ে বাস করতে,—সে দেশকে হয়তো দূর থেকে তোর স্বর্গরাজ্য বলেই মনে হয়,—কিন্তু তুই কি তা' পাবি ইচ্ছামাত্র? ধর্, এদেশের অনুমতি হয়তো তুই কোনো রকমে পেলি, কিন্তু তারপর সে দেশ তো তোকে ঢুকতে নাও দিতে পারে। আজকাল দেখতে পাচ্ছিস্ তো অনেক দেশেই বিদেশীদের থাকতে দিতে চাইছে না, এমন কি ঢুকতেও নয়। কেউই তার দেশের—তার জাতির এতটুকু স্বার্থও ছাড়তে রাজী নয় বিদেশীর জন্যে। চীনে বল্, রাশিয়ান্ বল্, জাপানী বল্, জার্মান্ বল্—সব ওই Deutschland Uber Alles!—সবার উপরে স্বদেশ সত্য, তাহার উপরে নাই!—তুই নিশ্চিত জানবি নীতা, স্বদেশ তোকে যত আঘাত যত

বেদনাই দিক্, তবু তার ওপর জন্মমাত্রে যে অধিকার তুই পেয়েছিস্ আর কোথাও তুই তা পেতে পারিস্‌নে। আজ যদি তুই চীন কি ইংল্যাণ্ড কি আমেরিকা গিয়ে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিতে চাস্ নিজেকে সে দেশের সঙ্গে, তবে তা' কখনও সম্ভব হবে না। যতই তোকে তারা প্রীতি-শ্রদ্ধা জানাক, মনে মনে তাদের সর্বক্ষণ সন্দেহ থাকবে তুই বিদেশী বলে। কোনো গূঢ় রাজনৈতিক তথ্য তারা প্রাণান্তে ফাঁস করবে না তোর কাছে। কেন জানিস্? তোর স্বার্থ আর তাদের স্বার্থ যে এক তা' তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে পারবে না কোনও দিন। তবেই বুঝতে পারছিস্, আমার দেশ—আমার জাতি—এর সঙ্গে আমার আত্মা যেমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, পরদেশের সঙ্গে তা' কখনো হতেই পারে না। সেই কারণেই দেশাত্মবোধের প্রয়োজন আছে, আমার দেশকে রক্ষা করার প্রয়োজন আছে—আমারই অস্তিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে—তার সত্তার স্বাভাবিক বিকাশের জন্যে। আমরা স্বদেশ ব'লে একটা দাঁড়াবার জায়গা বিনা সংগ্রামেই পেয়েছি তাই এর মূল্য বুঝতে পারছিনে। কিন্তু যদি জীবন দিয়ে জানতে হ'ত 'স্বদেশ' না থাকা কী জিনিস—যেমন করে জেনেছে ওই ইহুদীরা—তবেই আমরা বুঝতে পারতুম স্বদেশহীন 'বিশ্বনাগরিকের' কী সাংঘাতিক অবস্থা! সমগ্র জাতির জন্যে মিলিত সংগ্রাম তো আমরা কখনও করিনি, দুপাঁচটি এখানে ওখানে যারা জীবন দিয়েছে তাদের কথা আমরা কখনো তলিয়ে দেখিনি—এমনই আত্মসর্বস্ব জাত আমরা! তাই বুঝিনে যে যাকে এত সহজ বলে ভাবি তা' সত্যিই এত সহজ নয়, বুঝিনে যে শক্তি দিয়ে রক্ষা করতে না জানলে—ত্যাগের দ্বারা অর্জন করতে না জানলে—সমস্ত পাওয়াই একে একে হারিয়ে যায়। চীনের দিকে তাকিয়ে দেখ, সে জাত মিলিতভাবে সমগ্র দেশের জন্যে সংগ্রাম করেছে, তাই তারা আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে—প্রতিটি

অধিকার সম্বন্ধে এমন সচেতন হয়ে উঠেছে!' উত্তেজনায় এতখানি কথা ব'লে শঙ্কর চুপ ক'রে যায়—ক্লান্তিতে ওর চোখ আচ্ছন্ন হয়ে আসে। ওকে দেখেই বোঝা যায় কতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে ওর দেহ।

শঙ্করের কথার আর কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না নীতা। ও যা বলছে সবই তো সত্য, সে নীতাও জানে। আসল কথা হচ্ছে নীতা ঠিক যা বলতে চায়—যেখানে ওর বেদনা অভিমান—শঙ্কর যে তা' বোঝে না। দার্শনিক কিংবা রাজনৈতিক কোনোরকম তর্কেই নীতার রুচি নেই, সে শুধু ঘুরিয়ে শঙ্করকে এই কথাটাই জিজ্ঞাসা করতে চাইছিল যে—উমা কেন তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে? সে যে শঙ্করকে ভালবেসেছে—এমন একান্ত করেই বেসেছে—তার পুরস্কার কি শুধু এই অন্তহীন ঔদাসীন্য আর অবহেলা? সে নিজে নারী, সে তো বোঝে উমার ব্যথার গভীরতা কতখানি। শঙ্কর যা কিছু বলে—নীতার মনে হয় সবই যেন সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। ও যেন এ সংসার থেকে অনেক দূরের লোক, তাই ওর সুখদুঃখ চিন্তা-ভাবনা সবই ভিন্ন জাতের, ভিন্ন গোত্রের। যে কোনো সাধারণ মানুষের কাছে যা একান্ত বাস্তব, শঙ্করের কাছে তা ক্ষণিকের বিলাস বলেই প্রতিভাত হয়। আবার শঙ্করের কাছে যা' সত্য, এ সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে তা' দুর্বোধ্য পাগলামি কিংবা কাণ্ডজ্ঞানহীন মূঢ়তা!

'তুই বোস্ উমা, আমি ভাতটা চড়িয়ে আসি।' নীতা উঠে যায় রান্নাঘরের দিকে।

উমা ঘুরে ঘুরে বেড়ায় ঘরের মধ্যে। কখনো বা ছোট্ট ব্যালকনীটায় গিয়ে দাঁড়ায়। এ রাস্তাটায় গাড়ী-ঘোড়া কম, বাস্-ট্রামের উপদ্রব তো নেই-ই। পথের ওপর মেথরদের ছেলেগুলো একদিকে খেলছে ডাণ্ডাগুলি, আরেক দিকে ভদ্রবেশী ছেলের দল

ক্রিকেট্ খেলছে। মাঝে মাঝে হৈ হৈ চীৎকার উঠছে খেলুড়েদের মধ্যে থেকে। খানিক দাঁড়িয়ে আবার ঘরের মধ্যে চলে আসে উমা,—মান্ধাতার আমলের ভাঙ্গা পুরোনো আলমারিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। নড়বড়ে কাঠের পাল্লাটা সন্তর্পণে খোলে সে। ভেতরে কতকগুলো দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, আর গল্পের বই। এ বইগুলো সব উমার চেনা, যেগুলো ভালো লাগে সেগুলো অনেকদিন আগেই পড়েছে সে। তবু সময় কাটাতে সে নেড়েচড়ে দেখে বইগুলো, শঙ্করের স্পর্শটা যেন সে অনুভব করে এদের মধ্যে। ওরই প্রিয়, বহু-ব্যবহৃত বই এগুলো। তাই উমা এদের ভালবাসে। ওদের নিজস্ব মূল্যের জন্যে নয়, শঙ্কর ওদের ভালবাসে তাই।

দেখতে দেখতে হঠাৎ বইয়ের স্তূপের মধ্যে থেকে একটা চকোলেট্ রঙের ডায়েরী-বই ধুপ্ করে পড়ে গেল মেঝেতে। উমা ত্বরিতে বইটা হাতে তুলে নিয়ে তাকালো শঙ্করের দিকে। নাঃ, কৌতূহলী হয়েও তাকালো না ও, ঘুমিয়েই পড়েছে নিশ্চয়। যাক্, একরকম ভালোই। উমা এখন স্বচ্ছন্দে পড়তে পারে ডায়রীটা।…নাম লেখা নেই, কিন্তু লেখার ধরণ দেখেই সে বোঝে এ শঙ্করের হাতের লেখা, আর কারো নয়। কারো আত্ম-স্বীকৃতি এভাবে চুরি ক'রে পড়া উচিত নয়, একথাটা উমার একবার মনে হয়, কিন্তু কৌতূহলই জয়ী হয় শেষ পর্যন্ত। আর—বিবেককে প্রবোধ দেয় সে—সে তো ওর হিতাকাঙ্খী, তার দ্বারা কোন ক্ষতি তো হবার সম্ভাবনা নেই ওর। তবে?

সন্তর্পণে পাতা উল্টে যায় উমা। তারিখ অনুযায়ী লেখেনি শঙ্কর, এক জায়গায় লিখতে সুরু করেছে তো চার পাঁচ পাতা ধরে লিখে গেছে মনের কথাগুলো,—একেবারেই মামুলী ডায়েরীর মত নয়। তবে এগুলো গত বছরের লেখা সেটা ধরা যায়। পাতা

গুল্টাতে ওল্টাতে একটা পৃষ্ঠায় এসে থম্‌কে যায় উমার দৃষ্টি। এ কি দেখছে সে? তারই নাম—শঙ্করের ডায়েরীতে…

'…উমা আজ এসেছিল। আগের চেয়ে রোগা, ম্লান হয়ে গেছে!—কেন কে জানে? ও আমাদের অনেক করেছে, এতখানি যে পরমাত্মীয়ও তার বেশী করতে পারে কিনা সন্দেহ। আর ওর কাছে আমার যা ঋণ……কিছুই দিতে পারলুম না ওকে।

উমা আমাকে ভালোবেসেছে। আমিও যে ওকে…সে ও জানলো না। জানবেও না কোনোদিন। ওর আর আমার মধ্যেখানে র'য়ে গেল একটা চিরদিনের ভুল বোঝা। যদি ওকে সত্যি বোঝাতে পারতুম আমার বুকের কথা! সে আর হ'ল না…'

উমার দু'চোখ ছাপিয়ে জল নামে। শঙ্কর ওকে ভালোবাসে…? এ যে ওর স্বপ্নেরও অতীত। শঙ্কব তবে সত্যিই পাষাণ-দেবতা নয়। 'কিচ্ছু চাইনে, আর কিচ্ছু চাইনে, আমাকে তুমি ধন্য করেছ' —উমার সমস্ত হৃদয় বলে—'তোমার পায়ে তুমি আমায় একটুখানি স্থান দিও, সে আমার এত বেশী যে তার বেশী সুখ আমি কল্পনাও করতে পারিনে!'

* * *

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। টোস্ট্‌ক'খানা শেষ করে দুধের কাপে চুমুক দিতে দিতে শঙ্কর বললে—'উমা কখন গেলরে নীতা?'

'এইতো একটু আগে। কাল আবার আসবে। যাক্ তুমি এখন ঘুমিয়ে পড়, আলোটা নিভিয়ে দিই। খেয়ে—সব গুছিয়ে রেখে—আমি আসছি খানিক পরে।'

'বেশী দেরী করিস্‌নে কিন্তু—'

'না দাদা, বেশী দেরী করবনা। একটু বাদেই এসে আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেব। লক্ষ্মী ছেলে, ঘুমোতে চেষ্টা কর। সারাদিন কেবল শুয়ে শুয়ে ভাবছ যত রাজ্যের কথা।'

ভাইয়ের গায়ে নীলরঙের চাদরখানা বুক পর্যন্ত টেনে দিয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে নীতা চ'লে গেল। খোলা বারান্দা দিয়ে মাথায় হাওয়া এসে লাগছে, ভারী কোমল হাওয়া…। ওর মাথার চুলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে—যেন ওর সেই শিশুকালে হারিয়ে-যাওয়া মায়ের হাতের পরশ। আকাশভরা তারা মাথার কাছে খোলা বারান্দা দিয়ে দেখা যায়। অনন্ত নীল আকাশ—নিবিড় নীলকৃষ্ণ —ওই সপ্তর্ষিমণ্ডল জ্বল্‌জ্বল্ করছে—ছেলেবেলায় মা তার চিনিয়ে দিয়েছিল…। ওই জ্বলজ্বলে লাল তারাটা, কী নাম ওর?—মনে পড়ছে না। ছোটো—খুব ছোটোবেলায়—মা ওকে সঙ্গে করে ছাতে নিয়ে যেতেন সন্ধ্যার পর, প্রথম রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকে আঙুল দেখিয়ে চিনিয়ে দিতেন—ওই সন্ধ্যাতারা—ওই মঙ্গল —ওই কালপুরুষ—আর ওই—ওই যে দূরে একটা স্থির তারা দেখতে পাচ্ছ ওটা ধ্রুব। তারপর—সেই ধ্রুবতারা থেকে চ'লে যেতেন বালক ধ্রুবের করুণ কাহিনীতে। শিশু ধ্রুব গভীর অরণ্যে তপস্যা করতে গিয়ে পেল সেই ভুবনমোহন শ্যামসুন্দরকে। দেবতা যখন বর দিতে চাইলেন ধ্রুব বললে—ছাইগাদাতে স্বুবর্ণকণা পেলে তার কি কেউ ছাই ঘাঁটে? সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা' হৃদয়মন্থন ধন তাই পেলাম, কী আর চাইব রাজ্য সম্পদ্ মাণিক্যের আবর্জনা!… মায়ের বলার ভঙ্গিটি ছিল কী যে সুন্দর। শিশু ধ্রুব গভীর অরণ্যে কেঁদে কেঁদে ফিরেছিল শ্যামসুন্দরের দেখা পাবার জন্যে, সেই কান্নার রেশ বাজত ওর বালক হৃদয়ে। অনাদৃত, নির্বাসিত ভক্ত-বালকের কাহিনী বলতে বলতে মায়ের কণ্ঠ ছেয়ে আসত একটি সজল করুণ কোমলতায়, আজো তার স্পর্শ লেগে আছে ওর স্মৃতিতে…মায়ের মুখখানি কেমন ছিল?…

'দাদা ঘুমিয়ে পড়েছ?'

'না রে ঘুমুইনি। আয় এখানে বোস্।'

আলোটা আর জ্বালল না নীতা। আস্তে আস্তে গিয়ে বসল শঙ্করের মাথার কাছে। অন্ধকারে ভাইয়ের চুলে কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

'নীতা, আমি কী ভাবছিলুম জানিস্, এখনি?'

'কী?'

'মায়ের কথা।'

'মা!' প্রায় অস্ফুটস্বরে বললে নীতা।

'হ্যাঁরে নীতু, মায়ের মুখ তোর মনে পড়ে? এখুনি ভাবতে চেষ্টা করলুম, কেমন যেন ঘুলিয়ে গেল। তোর মুখের সঙ্গে যেন একটু একটু মেলে...'

'মুখের চাইতে মায়ের শরীরের চেহারাটা আমার বেশী স্পষ্ট মনে পড়ে। সেই সকালবেলায় স্নান করার পর লালপাড় কাপড় প'রে পিঠে চাবি ঝুলিয়ে কুট্‌নো কুটতেন ব'সে ব'সে, সেই ছবিটা আমাব খুব মনে আসে। আর মনে পড়ে সেই যে মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় নীল ভেলভেট্ পাড় সাদা শাড়ীটা পরে ছাতে উঠতেন, তারপব বসে পড়তেন একজায়গায়, আমরা দুজনে দুদিকে কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়তুম আর মা লালপরী নীলপরীর গল্প বলতেন —শুনতে শুনতে আমরা প্রায় ঘুমিয়ে পড়তুম, হাওয়ায় মার খোলা চুল উড়তো—' বলতে বলতে নীতার কণ্ঠ স্বপ্নালু হয়ে এল, ও যেন কোন্ জন্মান্তরে দেখা বিস্মৃতপ্রায় কোন্ স্বর্গলোকের কথা বলছে— 'সেই ছবিটা মাঝে মাঝে এত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, নিমেষের জন্যে মার মুখটাও ভেসে ওঠে চোখের সামনে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায়। আবার মনে মনে গড়ে তুলতে চেষ্টা করি মূর্তিটা, কিন্তু কিছুতেই আর সম্পূর্ণ ধরা দেয় না, কেবলই ভেঙে ভেঙে যায়।'

'অনেক—অনে-ক দিন হল আমরা মায়ের কথা বলিনি, না রে?'

'তুমি বছরের কটা দিনই বা আমার কাছে থাকো যে বলবে? সবসময় তো বাইরে বাইরে—রাত নেই দিন নেই শুধু কাজ কাজ কাজ, পারিবারিক জীবন বলতে আমাদের কিছু আছে নাকি? পরের কাজ নিয়েই ঘুরছ সবসময়…। আমি যদি হঠাৎ অসুখে পড়ি কি মরেই যাই তুমি তো জানতেও পারবে না, তোমার কোনও নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই যে কেউ তোমায় চিঠি দেবে। আর জানতে পারলেই বা কী, হয়ত আসতে একবার শেষ মুহূর্তে, তারপর আবার চলে যেতে আসাম কি বম্বে, ভুলে যেতে একেবারে যে নীতা ব'লে একটা বোন তোমার ছিল। বেঁচে থাকতেই যা মনে রাখো…'

'এই তোর ধারণা আমার সম্বন্ধে?'—সস্নেহে বোনের ডানহাতখানা ধরে বুকের ওপর টেনে আনল শঙ্কর।

'কেন তুমি কি আমার ধারণার চাইতে অন্যরকম কিছু? ওই উমা, ও তোমার যা' করেছে শত মা-বোন পারত না, কী দিলে তুমি তাকে প্রতিদানে? ভুলেও একটা মিষ্টি কথা বল তুমি তাকে? নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর, পাষাণ তুমি…'

'হ্যাঁরে ঠিকই বলেছিস্ আমি পাষাণই বটে'—বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে শঙ্কর—'যে আত্মীয় পরিজনদের খোঁজ নেয় না দেখে না সে পাষাণ ছাড়া কী?' ওর কণ্ঠস্বরে গভীর বেদনার আভাস পেয়ে নীতা অনুতপ্ত বোধ করে নিজের অসংযত কথার জন্যে।

'দাদা, রাগ করলে?'

'না রে পাগ্‌লী, রাগ করব কেন?' বাপ-মা-মরা বোনটাকে গভীর স্নেহে বুকের ওপর টেনে আন্‌ল শঙ্কর।

শঙ্কর ওর বেদনা বোঝে। সংসারে আর কেই বা আছে ওর ব্যথা বুঝবার, বিপদে অভয় দেবার, দুঃখে সান্ত্বনা দেবার মত? একলা এই কলকাতার জনারণ্যে কাটিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন স্কুলের মাষ্টারী করে। শঙ্কর জানে ওর মন এত কোমল এত

নিষ্পাপ যে ঘরে-বাইরে ও বড় একলা। এক আছে শুধু ওই উমা। কিন্তু উমা তো আর সব ব্যাপারে ওকে সাহায্য করতে পারে না। সে স্বাধীন নয়, বাপমা আছেন। তাছাড়া বিপদের সময় দরকার একজন দেহে-মনে বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ লোকের সাহায্য এবং সহানুভূতি। বলিষ্ঠতা, ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, এসব তো উমার মধ্যে আবার নীতার চাইতেও কম। এ ধরণের মেয়েদের জন্যে সত্যি বড় কষ্ট হয় শঙ্করের। না পারবে লড়াই করতে না পারবে মেনে নিতে। ওর বুকের শার্টের ওপর নীতার উষ্ণ অশ্রুজল অনুভব করে শঙ্কর।

'শোন্ শোন্ লক্ষ্মী বোনটি, এবার থেকে আমি তোকে চিঠি দেব যেখানে যাই, ঠিকানাও দেব। তোর কোনো দরকার হলে লিখিস্ তখুনি চলে আসব।' তারপর আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বলতে লাগল—'কী করব বল্ বোন, এমন যুগে জন্মেছি যে সমস্ত দেশটা একটা বিরাট ক্রাইসিসের মুখে। এত বড় দেশটা এমন করে বিনাদ্বিধায়—বিনাবাধায় মৃত্যুর অতল তলে তলিয়ে যাবে ক্রমশঃ, আর আমরা শুধু দাঁড়িয়ে দেখব সঙের মত, এ কী করে সম্ভব? দুঃখ, শোক, মৃত্যু আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে বোন, উপায় নেই, নইলে আমাদের স্বপ্নের ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে কী করে? সে ভারতবর্ষ আমরা হয়ত দেখব না বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ মানুষ দেখতে পাবে—সেই আমাদের আনন্দ সেই আমাদের গৌরব। আর যদি আমাদের এত দুঃখের সাধনা কোনোদিন সার্থক হয়, তবে তার থেকে প্রেরণা পাবে অন্য দেশেরও মানুষ, সত্য কখনো এক জায়গায় বদ্ধ থাকে না—ছড়িয়ে পড়ে আগুনের মত।'

'আমি বুঝি'—মুখ তুলে বললে নীতা——'তুমি যখন বল আমি বেশ বুঝতে পারি, একেক সময় মনে হয় আমিও নেমে পড়ব তোমার কাজে—লজ্জা অপমান কিছু গ্রাহ্য করব না—কিন্তু আবার

তারপরেই কেন যে এত অসহায় দুর্বল লাগে নিজেকে। এদেশে মেয়েদের জন্যে চারদিকে যেন কাঁটা বেছানো। রোজ সামান্য একটু পথে বেরোই, তাও কত গ্লানিকর অভিজ্ঞতা যে প্রত্যহ সইতে হয়, বেশী কিছু করার কথা ভাবতে ভয় পাই। যে দেশে মেয়েরা দিনদুপুরেও ভীড়ের মাঝে নিতান্ত দৈহিক সম্মানটুকু পর্যন্ত বাঁচিয়ে চলবার অধিকার পায় না, সে দেশে কী করে যে কী করতে পারি ভেবে পাইনে দাদা!'

নীতার কথাগুলো শুনতে শুনতে সমস্ত শরীরে যেন আগুন ধরে যায় শঙ্করের। অনেক কষ্টে নিজেকে দমন করে সে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে শঙ্কর বলতে লাগল—'একেক সময় তাই ভাবি নীতা, কী অদ্ভুত দেশেই আমরা জন্মেছি! নারীর এমন অবমাননা পৃথিবীর কোনো বর্বরতম দেশেও নেই। সামান্য একটা কুকুর কি ছাগলকেও আমরা যে মূল্য দিই মেয়েদেরকে তাতো দিইই না, উপরন্তু এত রকমের লাঞ্ছনা অপমান তাদের ওপর নিয়ত বর্ষণ করি যে এদেশের মেয়েরা ভুলে যায় যে তারা মানুষ। তারা জানে তারা শুধু মেয়েমানুষ। বংশানুক্রমে তাদের নৈতিক মেরুদণ্ডকে এমন করে আমরা ক্রিপ্‌ল্ করে দিই যে তারা কুঁজো হয়েই চিরদিন চলে, সোজা হয়ে দাঁড়াবার কল্পনাই তারা করতে পারে না। প্রাণ-চাঞ্চল্যের যা কিছু লক্ষণ—তার প্রকাশ আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে দেখা গেলে তা' বেহায়াপনা বা মস্তিষ্ক-বিকৃতির পর্যায়ে পড়ে যায়। তাই আমাদের মেয়েরা শৈশব থেকেই 'শান্ত', 'নম্র', সোজা চোখে তারা চাইতে পারে না, স্পষ্ট করে সত্য কথা বলা তারা নারীপ্রকৃতির বিরোধী এবং মেয়েদের পক্ষে ঔদ্ধত্যের প্রকাশ বলে জানে। তারা জানে তাদের জোরে হাঁটতে নেই, জোরে কথা কইতে নেই, প্রাণের আনন্দে ছুটোছুটি করা তাদের পক্ষে অসহ্য স্পর্ধা। আর তার পাশে ছেলেদের দেখ।

যত কিছু পাপ সংসারে থাকতে পারে তার পথ খোলা তাদের জন্যে। একদিকে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা—আরেক দিকে চরম দাসত্ব। এদেশে সমাজের যাঁরা মাথা, তাঁদের বুলি হল—আমাদের দেশ তো রাশিয়া চায়না নয়—আমাদের জল হাওয়া মাটি ভিন্ন, কাজেই এখানে নারী পুরুষের জীবনের গতিও হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। চমৎকার যুক্তি! —চমৎকার ভাঁওতার ব্যবসা! এ ব্যবসা তো চিরদিনই করে আসছে ওই ধনতান্ত্রিক সমাজ! চীনের সমাজপতিরাও একদিন বুঝিয়েছিল—চীন তো ইংলণ্ড বা আমেরিকা নয়, তার আলাদা সভ্যতা ঐতিহ্য কৃষ্টি আছে, কাজেই সে দেশের মেয়েদের জন্যে প্রয়োজন কাঠের জুতো পরা খোঁড়া পা, বহুপত্নীক পুরুষের লালসার দাসত্ব, আর অন্যায়ের কাছে নীরব আত্মসমর্পণ! আজ আমাদের সমাজে নারীর দাসত্ব এমন সর্বব্যাপী যে সমস্ত পৃথিবী ঘুরে-আসা চার-পাঁচটা ডিগ্রীধারী মেয়েদের মনেও মুক্তির আলোক মাত্রও প্রবেশ করেনি। —উল্টে বরং তাদের বেশীর ভাগই নিয়ে এসেছে কুৎসিৎ নীচতা আর উচ্ছৃঙ্খলতা! এরও প্রধান কারণ কী জানিস? এদেশের মেয়েরা কোনওদিন একযোগে লড়াই করেনি। যেটুকু স্বাধীনতা তারা পেয়েছে সে শুধু হাতে-তুলে-দেয়া স্বাধীনতা। বিনা সংগ্রামে যা পাওয়া যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখবি তার মূল্য বোঝে না মানুষ। ঠিক যে কারণে ১৫ই আগস্ট্‌এর স্বাধীনতাকে এমন অকাতরে আমরা বিলিয়ে দিচ্ছি শয়তানের পায়ে!'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দুজনে। তারপর নীতাই এক সময় স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললে—'দাদা, মায়ের কথা বল, বড়ো ইচ্ছে করছে আজ মার কথা শুনতে...'

'কী যেন বলছিলুম—ঠিক মনে পড়ছে না......'

'সেই যে সন্ধ্যেবেলায় ছাতে বসে রূপকথা বলতেন, আর আমরা কোলে মাথা দিয়ে শুনতাম....—'

সত্যি, কী যে সুন্দর এসব স্মৃতি! যেন স্বপ্নের মত মনে হয়…। কত যুগযুগান্ত পার হয়ে গেছে তার পরে, কালের স্রোত ফেলে রেখে গেছে দৈনন্দিন শতসহস্র ঘটনার স্তূপ সেই দিনগুলির উপরে, স্তরের পর স্তর ঠেলে এখন তাদের খুঁজতে হয়।

'সেই যে রবীন্দ্রনাথের কী একটা কবিতা আছে না, বল্‌তো নীতা, আমার সবটা মনে নেই। সেই যে সেই—

মাকে আমার পড়ে না মনে
শুধু কখন খেলতে গিয়ে হঠাৎ অকারণে—

শঙ্করের আবৃত্তির খেই ধরে নীতা বলে যায় সমস্ত কবিতাটা। ধীর মৃদুকণ্ঠে ও বলে, একটি সকরুণ কোমলতায় ওর কণ্ঠ ছেয়ে আসে।

মা যেন গান গাইত আমার দোল্‌না ঠেলে ঠেলে
মা গিয়েছে, যেতে যেতে গানটি গেছে ফেলে।…
কোলের 'পরে ধরে কবে দেখত আমায় চেয়ে,
সেই চাউনী রেখে গেছে সারা আকাশ ছেয়ে।

নীল আকাশের দিকে তাকায় দুজনে। ওই জ্বল্‌জ্বলে তারার মেলায় মায়ের স্মৃতি লেখা আছে, ওদের দিকে চাইলে মনে হয় বুঝি ওদের শিশুকালে পালিয়ে যাওয়া মা আজো হারায়নি—ওই ধ্রুবনক্ষত্রের মতই সুদূর কিন্তু জ্যোতির্ময়—অম্লান। তারা হয়ে ওই নীল আকাশের কোল থেকে তাদের মা জান্‌লা দিয়ে চেয়ে আছে নির্নিমেষে ধূলির ধরণীতে ফেলে আসা দুটি ছেলেমেয়ের পানে।…

আট

'আচ্ছা বিন্দুদি, পরী এতদিন ধরে আসছে না কেন বলতে পার ?'—বাড়ীর ঝি বিন্দুকে বলছিল বিভা—'কই এমন একটানা না-আসাতো ওর কখনো হয়না! একদিন দু'দিন নয় কুড়িদিনের ওপর হতে চলল…'

'কী করে জানবো বৌদিমণি, ও তো থাকে সেই অনেক দূরে, বাবুরবাঁদার কাচে। তবে ওর সোয়ামীকে সেই জানোতো—একেবারে গোঁয়ার মাতাল, মারধোর করে, কি জানি সেই পোড়ামুকোই কিচু কল্লে নিকিন্। যা নোক, খুনখারাপিও কত্তে পারে সে…'

'কী বল্‌ছ বিন্দুদি ? খুন করতে পারে ?'

'খুব পারে বৌদিমণি, আমাদের ছোট নোকের ঘরে সব পারে… আর ছোটনোকের ঘরেই বা বলি কেন, ভদ্দর নোকের ঘরেই কী বাদ আচে ? এই তো সিদিন গব্‌নে অদিকারী যে কাঁসার ঘটি ছুড়ে বৌটোকে মেরে ফেললেক্, তা' কি কেউ বিচার কল্লে তার ? গাঁ-সুদ্দু নোক্ বলচে বৌটো বড় বদ্ ছিল, মরেচে আপদ গেইচে! তা' ক্যা ভালো আর ক্যা মন্দ বিন্দে মেটের জানতে আর বাকী নাই। কিন্তু একে ছোট নোক্, তাতে মেয়েমান্‌ষের কতা—কে শুনবেক বল ?'

'আচ্ছা বিন্দুদি, আমাকে নিয়ে যেতে পার পরীর ঘরে ?'

'মা-ঠান্ যে চটে যাবেন বৌদিমণি, আমার যে চাকরী থাকবে না !'

'ঠিক আছে। তোমার কাজ শেষ হয়ে গেলে যাবার সময় ওই উষাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, বুঝলে ? আমি ওখান থেকে তোমার সঙ্গে যাব।'

'মা-ঠান্ বড্ড রাগ করবেন বৌদিমণি...'

'করুনগে। আমি কারো ক্রীতদাসী নই। অন্যায় যখন করছি না তখন ভয় কিসের?—আর—উনি জানবেনই বা কী করে? —বুঝলে বিন্দুদি, সন্ধ্যেবেলা চুপিচুপি যাব আর আসব। দারোয়ানকে বলে দেব যেন ও কাউকে না বলে...'

'যা ভাল বোজো করো বৌদিমণি, আমার কিন্তু ভালো নাগচে না...' বলতে বলতে বিন্দু চলে গেল নিজের কাজে।

* * *

আঙ্গিনার তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যার ছায়া ঘন হয়ে এসেছে। একবার চারিদিকে চেয়ে চুপিচুপি দেখে নিল বিভা। নাঃ, কিরণময়ীর এখন এদিকে আসবার কোনও সম্ভাবনা নেই। ঠাকুরঘরে ছিলেন একটু আগেই দেখে এসেছে সে। ওখান থেকে এখন নড়বেন না সহজে। গোবিন্দ-বল্লভ তাঁর প্রাণ...

'আমি যে বাইরে যাচ্ছি কাউকে বোলো না, বুঝলে তেওয়ারী। শুধু যদি ছোটোবাবু জিজ্ঞেস করেন তবে বোলো।'

'ঠিক আছে মাইজী, হামি সব্ সমঝেছে—'

নিশ্চিন্ত হয়ে পা বাড়াল বিভা।

'এ কী বৌমা, এ তিনসন্ধ্যের বেলা একলা কোথা যাচ্ছ?'

হঠাৎ পথের ওপর বজ্রাঘাত হলেও বোধ হয় এতখানি বিস্মিত হত না বিভা। এ সময় তো কিরণময়ীর এখানে আসার কথা ছিল না...। যাই হোক ধরা যখন পড়েইছে তখন শক্ত হওয়াই ভালো। বাস্তবিক, কোন অন্যায় না করেও এই ধরাপড়ার ভাবটা যে তার নিজের মনেই আসতে পেরেছে এই চিন্তাটাতেই বিভার সর্বাঙ্গ কঠিন হয়ে উঠল। আর বাড়ীর দারোয়ানের সামনে এভাবে জেরা করা...মুহূর্তে সমস্ত মন বিষাক্ত হয়ে উঠল ওর।

'আমি পরীর বাড়ী যাচ্ছি মা।'

'পরীর ঘর যাবার কী দরকার? সে ভালো হলে আপনি আসবে। আর—তুমি কি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছ বৌমা? বনেদী জমিদারবাড়ীর বৌ—এই রাতের বেলা—এমন একলা ঘরের বার হয়ে যাচ্ছ, তাও আবার কাকেও না বলে,—কাল সকালে উঠে যে আর কাউকে মুখ দেখান যেত না! এসো ঘরে এসো—'

'আমি যাবো বলেই বেড়িয়েছি মা—'

বিভার ঔদ্ধত্যে অবাক্ হয়ে গেলেন কিরণময়ী। মুহূর্তের জন্যে তাঁর মুখ দিয়ে কথা বার হল না। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসচেতন হয়ে উঠলেন তিনি। এবং সাক্ষীরূপী দারোয়ানের উপস্থিতি তাঁকে দ্বিগুণ প্রজ্বলিত করে তুলল। নীচু কঠিনস্বরে তিনি বললেন—'কেলেঙ্কারী কোরো না, ঘরে এসো।'

সঙ্গে সঙ্গে বিভার রোষে ঘৃতাহুতি পড়ল।

'একটা গরীব অসহায় মেয়েকে ভালোবাসা দেখাতে যাওয়া আপনাদের কাছে কেলেঙ্কারী হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে নয়। এর বেশী কিছু বলবার আমার সময়ও নেই প্রবৃত্তিও নেই।'
প্রত্যুত্তরের অপেক্ষামাত্র না করে সে পা বাড়িয়ে দিল। স্তম্ভিত কিরণময়ী স্থির পাষাণের মত চেয়ে রইলেন তার চলার পথের দিকে। একটা শব্দও নির্গত হল না তাঁর মুখ দিয়ে।

গ্রামের প্রান্তে পরীর কুটীরের সামনে যখন বিভা এসে উপস্থিত হল তখন সন্ধ্যার নির্জন অন্ধকার নিবিড় হয়ে নেমেছে নিরালা ধূধূ-করা মাঠের শেষ সীমানায়। 'আমি এখন তবে যাবো বৌদিমণি?'—সারাদিনের কর্মক্লান্ত, গৃহোন্মুখ বিন্দুর প্রশ্নের উত্তর দিতে বিলম্ব করে না বিভা: 'হ্যাঁ বিন্দুদি, তুমি বাড়ী যাও, পথ আমি চিনে যেতে পারব।'

একটু এগিয়েই সামনে একখানা পাতায় ছাওয়া ঘর। তার দরজাটা আলগাভাবে ঠেসান। ওই ঘরেই পরী থাকে, বিন্দু ব'লে

গেছে একটু আগে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বিভা। আস্তে আস্তে দরজাটা খুলল। ভিতরে একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কী ব্যাপার, কেউ নেই নাকি? খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বিভা। উঁ......একটা গোঙানি যেন ভেসে আসছে ঘরের ভিতর থেকে, মনে হল ওর। হ্যাঁ—গোঙানিই বটে—ক্রমশঃ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। 'পরী! পরী!'—সমস্ত শক্তি সংহত করে ডাকল বিভা।

'কেঁগো...এঁই ভেঁতরে এস...উই দোঁরের ডানধারে কুলুঙ্গিতে লম্প—জ্বাঁলো—নইলে ভঁয় পাবে...'

খোনা হ'লেও বিভা বুঝতে পারে এ পরীর গলা। কিন্তু এরকম অবস্থা কেন? নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কোনো রোগ...অথচ ঘরে কেউ নেই—একেবারে অন্ধকার। এমনি করে আত্মীয়স্বজন কখনো ফেলে যায় কাউকে? ...অন্ধকারে সাবধানে পা ফেলে বিভা...দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে শেষে কুলুঙ্গির কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। একটা কেরোসিন ল্যাম্প্ আর একটা আধ-ভাঙ্গা দেশলাইয়ের বাক্স ওর হাতে ঠেকে।

ঠাণ্ডা ভিজে কাঠিটা ঘসে ঘসে অনেক কষ্টে দেশলাইটা ধরায় বিভা। তারপর ল্যাম্প্টা জ্বলে উঠতে ও একটু সুস্থ বোধ করে। চারদিক নিরালা নিঃঝুম, ভুতুড়ে অন্ধকার, আর ঘরের ভিতরে নিঃসঙ্গ এই রোগী—তার অমানুষিক খোনা খোনা গোঙানির আর বিরাম নেই। এই অদ্ভুত কণ্ঠরোধকারী পরিবেশে ওই লালচে আলোর শিখাটুকুই একমাত্র ভরসা। তাম্রাভ পাণ্ডুর আলোয় ঠাহর করে দেখে বিভা ঘরের কোণে একরাশ ছেঁড়া কাঁথার জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছে—মানুষ, না কঙ্কাল? প্রেতের চেয়েও ভয়ঙ্কর এই মূর্তি—মনে হল তার। শুষ্ক শীর্ণ একটা নারীদেহ, মুখ থেকে পেট পর্যন্ত দগ্দগে ঘা—বীভৎস তার চেহারা, চক্ষু কোটরাগত, মাথার চুল

জট-পাকানো,—মধ্যে মধ্যে প্রচণ্ড আর্তনাদ উঠছে ওই দেহটার অভ্যন্তর থেকে, আর সাথে সাথে নিদারুণ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে দেহটা··· ।

'একী রে পরী ? এর'ম হল কেন ?' রুদ্ধকণ্ঠে বললে বিভা।

'অঁসিড্ খেঁচি···উঁই যে হাতুড়ে চক্কোত্তি—উ'র ঘঁরে চুরি কন্নু···'

'অ্যাসিড্ ? কেন খেলি ? কোনো দুঃখ হয়েছিল তো আমার কাছে যাসনি কেন ?—'

'বঁড়ো দুঁঃখে খেঁচি গো···উঁই হুঁীরুর বাঁপ—উঁ থাকতে আঁমার সোয়াস্তি নাই এ পিতিমিঁতে। ছেঁলেটারে দেঁকো গো—উঁ···আঁর কঁতা বলতে নাচ্চি গোঁ···'

হতবুদ্ধি হয়ে গেছে বিভা। এমন অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন কখনো হয়নি সে। এখুনি তো ডাক্তারকে খবর দেয়া দরকার, অবশ্য ডাক্তার ডেকেও আর ফল কতদূর হবে সন্দেহ। দেখেশুনে শেষ অবস্থা ব'লেই মনে হচ্ছে তার··· ।

'বিভা!' বুকের কাছে হৃৎপিণ্ডটা ধক্ করে উঠল বিভার। সামনে—একেবারে দোরগোড়ায় নিশিকান্ত। বিভা চেয়ে আছে তার দিকে—সেও চেয়ে আছে বিভার দিকে—দুজনেই নির্বাক। পরিস্থিতির আকস্মিকতায় প্রায় চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছে ওরা।

'কী ব্যাপার, বিভা ?'—অনেকক্ষণ পরে প্রশ্ন করল নিশিকান্ত।

'একটা ভালো ডাক্তার আনতে পার ? ভালো ডাক্তার—'প্রায় অস্ফুটস্বরে কথা বললে বিভা, ঘরের ভেতর থেকে। পরীর দিকে ক্ষণমাত্র চেয়েই বেরিয়ে গেল নিশিকান্ত।

নিশিকান্ত যে বেরিয়ে গেল তো গেলই—আর ফিরবার নাম নেই। সময় যেন পাষাণভারের মতো বুকে চেপে বসে থাকে বিভার। কেরোসিন ল্যাম্পের লাল আলোর শিখাটুকু ক্রমেই যেন

ম্লান হতে ম্লানতর হয়ে আসছে—মনে হয় তার। ঘরের মাঝখানে খানিকটা জায়গা জুড়ে পাণ্ডুর আলো কাঁপছে—তার চারপাশে দীর্ঘ ভুতুড়ে ছায়া দুলছে সমস্ত দেয়ালের গায়ে—মাটির মেঝেতে। বাইরে চারপাশে ছমছমে অন্ধকার। অদূরে বাঁশের বন ঘন ঘন দুলছে হাওয়ায়,—পত্ররাশির ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত ঝোড়ো বাতাসের কান্না থেকে থেকে শুনতে পাচ্ছে বিভা—হু-হু-হু—হু-হু-হু। আর পাচ্ছে শুনতে পরীর কাৎরানি—অবিচ্ছেদ—বিশ্রামবিহীন। প্রতিটি মুহূর্ত যেন একেকটি যুগ বলে মনে হয় বিভার। উঃ! নিশিকান্ত কখন ফিরবে?

মানুষের কথাবার্তা কাণে যাবামাত্র সম্বিৎ ফিরে পেল বিভা। খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেল বাইরে জুড়িগাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, আর একজন ডাক্তারকে সঙ্গে করে নিশিকান্ত উঠে আসছে দাওয়ায়।

'ইনি হচ্ছেন গোবিন্দপুরের নামকরা ডাক্তার সদানন্দ দাশ, যদি কিছু করা সাধ্য হয় ইনি করবেন।' বলতে বলতে নিশিকান্ত সদানন্দ দাশকে ঘরের ভেতর আহ্বান করে নিয়ে এল। ডাক্তার বসলেন, পরীকে দেখলেন, জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, তারপর নিশিকান্তের দিকে তাকিয়ে বললেন—'Beyond all remedy! আর বেশী দেরী নেই—' বাক্স গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়লেন সদানন্দ দাশ।

ডাক্তারকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে ফিরে এল নিশিকান্ত।

'বিভা, এখন তবে বাড়ী চলো। আর তো করবার কিছুই নেই! এখানকারই কোনো কম্পাউণ্ডারকে দিয়ে নাহয় মরফিয়া দেবার ব্যবস্থা করতে পারি, যন্ত্রণাটা কম পাবে। সদানন্দবাবু তাই বলে গেলেন।'

'তুমি বাড়ী যাও, আমি তো আর ও বাড়ীতে ফিরতে পারব না।' বললে বিভা।

'কেন বিভা, কেউ তো তোমায় তাড়িয়ে দেয়নি। তুমি নিজে

থেকেই এসেছ। তুমি ফিরে গেলে সবাই খুশী হবে। আর যদি না ফেরো…তার মানে আমাদের সমস্ত সংসারটা চিরদিনের মত বিধ্বস্ত হয়ে যাবে!'

'আমি ফিরলেও তাই হবে বলেই আমার ধারণা। আমি যতদিন থাকব তোমাদের সংসারে, আগুন জ্বলবে—শান্তি আর আসবে না কোনোদিন!'

'শান্তি!'—ক্লান্ত, বিষণ্ণ একটু হাসি দেখা দিল নিশিকান্তর ঠোটে—'বিভা, ক্ষমা বলে কি কিছু নেই তোমার? বোঝো না যে অজ্ঞতার ওপর রাগ করা কতখানি ছেলেমানুষি? —দেখো, সত্যি করে এর দ্বারা চরম ক্ষতি হবে কাদের? আমাদের। আমাদের দু'জনের। বাইরের কতকগুলো লোকের ভুলের জন্যে আমাদের ভালোবাসাকে—আমাদের সম্পর্ককে কেন আমরা এমন করে মিথ্যে হয়ে যেতে দেব, বলো? মা, বাবা—এঁরা আর ক'দিন? সামান্য ক'টা দিনের জন্যে থাকো একটু ধৈর্য ধরে—তারপর তোমার যা' খুশী কোরো। আমাকে তো জানো, আমি তোমার কোনো কাজে বাধা দেব না।……আমার মাকে তো তুমি কোনোদিনই চিনলে না! কতখানি আত্মগ্লানিতে তিনি এখন দগ্ধ হচ্ছেন তা' জানো? এমন হবে জানলে তিনি কখনোই তোমাকে এখানে আসতে বারণ করতেন না। বিভা, যদি আর কোনো যুক্তি তুমি নাও শোনো, তোমার কাছে ভিক্ষুকের মত আমি কৃপা প্রার্থনা করছি, তুমি আজ ফিরে না গেলে আমাদের এ গ্রাম থেকে বাস ওঠাতে হবে, আমাদের যা কিছু চরম সর্বনাশ সম্ভব তার কিছুই বাকী থাকবে না…'

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিভা বললে—'চলো।'

* * *

পরদিন দুপুরের দিকে পরী মারা গেল। শবদেহ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে বেলা গেল গড়িয়ে। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে নিশিকান্ত

এসে খবর দিলে বিভাকে: 'পরীর দেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—সব ব্যবস্থাই করেছি—তুমি যদি একবার দেখতে চাও তো...'

'আমি শ্মশানে যাবো।'

'শ্মশানে যাবে?'—একবার মাত্র বিভার চোখের দিকে চেয়েই নিশিকান্ত বললে—'ঠিক আছে। এস, আমিও যাচ্ছি।'

রূপনারায়ণের তীরে বিস্তীর্ণ বালুর চর। যতদূর দৃষ্টি যায় ধূ-ধূ বালুকারাশি চন্দ্রালোকে রজতধূসর। এখানে ওখানে ছোটো ছোটো বালির স্তূপ—কাঁটার গাছ—দু-একটা ভগ্ন নরকঙ্কাল......। একপাশে একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে—তার ওপর গিয়ে বসল বিভা। অদূরে শববাহকের দল কাঠের ওপর কাঠ দিয়ে চিতা সাজাচ্ছে—তাদের অস্ফুট কথাবার্তা ভেসে আসছে...। সামনে রূপনারায়ণের জ্যোৎস্নালোকিত জলস্রোত—মৃদুতরঙ্গভঙ্গে লীলায়িত। ওপারের বনরাজির দিগন্তলীন শ্যামাভরেখা দূরগামী জলরাশির বুকে দীর্ঘ ম্লান ছায়া ফেলেছে। এপারে নিবিড় মসীকৃষ্ণ অরণ্যানী কী এক মহাপ্রতীক্ষায় স্তব্ধ, রুদ্ধশ্বাস।...

দাউ দাউ দাউ—চিতার শিখা উঠছে ওই আকাশের বুক চিরে—ধ্যানলীন শ্মশানের মহামৌন ভঙ্গ করে। নিবিড় নীলাম্বরে অগণ্য নক্ষত্ররাজি অনির্বাণ মহিমায় জ্বলে......।

লেলিহান্ অগ্নিশিখার গম্ভীর রণণে আহুতির মহামন্ত্র উঠছে ওই ঊর্দ্ধে—আরো ঊর্দ্ধে—ওই সুদূর মহাব্যোমের গভীরে—গভীরে—বিলীন হয়ে যাচ্ছে অনন্তের অন্তর্লোকে। যত লাঞ্ছনা—যত কষ্ট—যত অপমান—আজ সব শেষ। সব শান্তি। সব বিসর্জন।

নয়

বর্ষা ঝরছে। নিকষ কালো আকাশ বেয়ে ঝরছে ঘন অন্ধকার ভ'রে অবিরলধারায়—বিশ্রামবিহীন। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি এক নিবিড় মহা-ঐকতানে মেতেছে—তাই কাণ পেতে শুনছিল বিভা। মেঘের গুরুগর্জনে—বাগানের গাছপালাগুলোর অশ্রান্ত লুটোপুটি আর বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে—কঠিন ধরণীর বুকে আহত বারিধারার একটানা ক্রন্দনে—পথহারা কোন্ খ্যাপা মুসাফিরের বিশ্বব্যাপী বেদনা বাজছে। বিভার মনে হয়—দূরে—সমস্ত সংসার থেকে অনেক দূরে—কোথায় যেন সে চলে গেছে—শতসহস্র চেষ্টা করলেও আব ফিরতে পারবে না সে।

ভুল। সমস্ত অতীতেব প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে একবার পিছন পানে চেয়ে দেখে বিভা। ভুলের পরে ভুলের বোঝা সঞ্চিত হয়েছে স্তবে স্তবে। একদিন ও নিশিকান্তকে ভালোবেসেছিল। প্রথম যৌবনের রঙীন উচ্ছ্বাসে কত স্বপ্ন যে দেখেছিল……। যাকে একদিন সে পবম বন্ধু মনে করে হাত বাড়িয়েছিল পথের সাথী করে নেবার জন্যে—সেও তো আজ তাকে বুঝতে পারলে না! বাইরে যতই সে শান্তমূর্তি হোক, ভিতরে ভিতরে তার যে নীরব অভিযোগ ধূমায়িত হয়ে উঠছে—সে কি বিভার চোখ এড়াতে পারে?… মূঢ়। বিভা ভুলেছিল ওর বাস্তব সত্তাকে—ভুলে গিয়েছিল যে ও বাংলা দেশেব মেয়ে—বাঙালীর ছেলেকে বিয়ে করেছে—ওর চারদিকে বাঙালীর সমাজ ভুলে গিয়েছিল যে এদেশের মাটিতে নারীর পক্ষে চরম সত্য তার দেহ—আত্মা বলে কোনো পদার্থ থাকা তার পক্ষে অপরাধ। ভুলে গিয়েছিল যে এদেশের লোকের চোখে নারী শুধু একটা চেতনাবিহীন দেহপিণ্ড—শুধু পুরুষের পাশব লালসার সামগ্রী—তার বাইরে কোনো স্বতন্ত্র সত্তা তার নেই। যদি থাকে—এ সমাজে প্রলয় ঘটবে…

'বিভা !'

অন্ধকার ঘরে কখন যে নিঃশব্দ পায়ে নিশিকান্ত এসে দাঁড়িয়েছে ওর পিছনে—জানতে পারেনি বিভা। সন্ধ্যার ম্লান আভায় স্ত্রীর মুখের ভাব বুঝতে পারল না নিশিকান্ত—শুধু দেখতে পেল সামনে খোলা বাতায়নপথে বৃষ্টির ছাঁট্ এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে তার পদপ্রান্ত—আর উন্মুক্ত কালো চুলের রাশি নেমেছে তার মুখখানি ঘিরে।

'আমাকে মার্জনা কর বিভা!' ব'লে একটা হাত ওর তুলে নিল নিশিকান্ত।

'মার্জনা কিসের ? তোমার তো কোনো অপরাধ নেই।' শান্ত চোখে স্বামীর দিকে চাইলো বিভা।

এত কোমলকণ্ঠে অনেকদিন কথা বলেনি বিভা তার সঙ্গে। কিন্তু এই কোমলতা—ওই চোখের বিষন্ন শান্তভাব—এর মধ্যে যেন একটা সুদূরতার আভাস আছে—মনে হল নিশিকান্তের।

'অপরাধ যে আছে সে আমি জানি নিজে। আমি জীবনে কাউকেই কিছু দিতে পারলাম না বিভা, সকলকেই শুধু বঞ্চিত করে গেলাম...'

'তোমার যা' সাধ্য তুমি তা' দিয়েছ। তুমি তো চেষ্টার ত্রুটি করোনি!'

'হয়তো করিনি। কিন্তু সবাই কেন আমায় এমন দূরে ঠেলে রেখেছে বিভা, এমন কি তুমিও—'

'আমি তো দূরে ঠেলে রাখিনি! শুধু তুমি কেন—সবার সঙ্গে—সমস্ত মানুষের সঙ্গে এক হয়ে মিলতেই তো আমি চেয়েছিলুম। কিন্তু তোমাদের সমাজ তো পারলে না আমাকে তার বুকের মধ্যে আপন করে টেনে নিতে। বাইরে থেকে তুমি একা কাছে রইলে বটে—কিন্তু ভিতর থেকে কত দূরে সরে গেলে—সে তুমি নিজেই

জানো না হয়তো। মনে হয়—তোমার আর আমার মধ্যেখানে কী যেন এক দুর্লংঘ্য ব্যবধান, শুধু ভালোবাসা দিয়ে তা' অতিক্রম করা যায় না। তোমার সংস্কার, তোমার আশা আকাঙ্খা বিশ্বাস—তোমার সমস্ত জীবনদর্শনের সুরটাই যেন আমার সাধনার বিপরীতমুখী। শতসহস্র চেষ্টা করলেও আমরা কোনোদিন মিলতে পারব না!' বেদনায় বিভার কণ্ঠ ধরে এল।

'একথা বোলোনা বিভা, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব কী নিয়ে?' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল নিশিকান্ত।

একটু বুঝি হাসবার চেষ্টা করল বিভা: 'একটা মানুষ গেলে জীবন অচল হয় না। তাহলে মৃত্যুকে সহ্য করে কেমন করে? আর—একদিন বুঝতে পারবে মানুষে মানুষে অন্ধ মোহকে অতিক্রম করে বাঁচাই বাঁচা, মুক্তিই যথার্থ জীবন—তা' সে যত দুঃখের মূল্যেই কেনা হোক্।'

'তাই যদি হয় আমি মুক্তি চাইনে জীবন চাইনে বিভা, আমি আমি শুধু তোমাকে চাই।'

'আমাকে চাও? না আমার দেহটাকে চাও? আমার আত্মাকে হত্যা করে ফেলে প্রাণহীন দেহটাই যখন তোমার কাম্য, তখন যে কোনো নারী হলেই তো তোমার চলে। তেমন যেকোনো একজনকে তুমি সহজেই পেতে পারবে, আমি তোমাকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেব—আইনতঃ ধর্মতঃ....'

'কসাইও তার পাঁঠাকে এর চেয়ে বেশী দয়া দেখায় বিভা!'—বিভার কথায় বাধা দিয়ে বললে নিশিকান্ত।

'যদি তোমায় ব্যথা দিয়ে থাকি—আমাকে মার্জনা কর। কিন্তু একটা সত্য কথা তোমায় আজ বলি—এ আমার নিজের উপলব্ধি। মানুষের দেহের কোনো জাত নেই—জাত আছে তার মনের। সেখানেই কেউ পুরুষ কেউ নারী—কেউ ব্রাহ্মণ কেউ ক্ষত্রিয় কেউ

চণ্ডাল। সেইখানে তোমার আর আমার মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান...। একদিন ছিল'—বলে জানালা দিয়ে বাইরে বর্ষণমুখর রাত্রির দিকে চাইলো বিভা—'যখন এম্‌নি কোনো শ্রাবণসন্ধ্যায় একটা সামান্য কথা কি চাউনি দিয়ে পর্যন্ত তুমি আমার হৃদয় জয় করে নিতে পারতে। আমি সেদিন ছিলুম মূঢ় বালিকা! কিন্তু আজ—আজ আমি অনেক কিছু জেনেছি, অনেক কিছু বুঝেছি। বুঝেছি যে আমি যদি চাই আমার সত্যপথে চলতে, তবে এই বাড়ীতে এই পরিবারের মধ্যে থেকে তা' কখনোই সম্ভব হবে না। এটা তো হোটেল নয় যে যে যার ইচ্ছেমত চলবে—অথচ কোথাও কারো তাতে আঘাত লাগবে না! এখানে পদে পদে আত্মীয়তার বাঁধন, যদি একতালে একছন্দে না চ'লে কেউ হঠাৎ একদিকে ধূমকেতুর মত ছুটে যেতে চায় তবে সঙ্গে সঙ্গে টান পড়বে সেই বাঁধনে। তার বেদনা প্রচণ্ড হয়ে বাজবে সবাইকেই। এর শেষ পরিণতি—বিচ্ছেদ।...অবশ্যম্ভাবী। যা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়—যা' এত ক্ষণভঙ্গুর—তাকে মূঢ়ের মত আজ ধরে থাকলে তাতে শুধু বেদনাই বাড়বে।...আর আমার অন্তরের অন্তরতম ক্রন্দনকে কণ্ঠরুদ্ধ করে যদি তোমাদের এই সংসারে আমি থাকি, তবে তুমি যাকে পাবে সে তো আর আমি নয়, সে শুধু একটা দেহমাত্র। তাই তুমি চাও। এতে কী প্রমাণ হয় জানো? আমার ব্যক্তিসত্তার কোনো মূল্য তোমার কাছে নেই। প্রমাণ হয় যে তোমার জীবনে আমার আসা একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। আমার বদলে আর যে কেউও আসতে পারত!'

এতক্ষণ বিমূঢ়ের মত ওর দিকে চেয়েছিল নিশিকান্ত, এবার মৃদুকণ্ঠে বললে—'তুমি যা বলছ তা তর্কের সত্য—অন্তরের সত্যের সঙ্গে তা সব সময় নাও মিলতে পারে। সত্যের অনেক দিক, তার কোনোটা বুদ্ধি দিয়ে—কোনোটা কল্পনা দিয়ে—কোনোটা অনুভব

দিয়ে জানা যায়। তুমি চলছ বুদ্ধির পথে—তাই সত্যের একটা বিশেষ দিকই তুমি দেখতে পাচ্ছ—সম্পূর্ণ রূপ পাচ্ছ না। আমার ভূমি থেকে আমার দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে আমাকে তুমি বুঝতে পারতে—আমার প্রতি সহানুভূতিও তোমার থাকত।'

'সহানুভূতি আছে। কিন্তু দয়া মায়া স্নেহের চাইতেও যা' বড় সে হল মানুষের বিবেক। এর চাওয়া যে কত তীব্র—আগে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি…'

তারপর একটু থেমে বিভা বলতে লাগল—ওর গলার সুর তখন পাল্টে গেছে—'তুমি ভাবছ তোমাকেই শুধু ব্যথা দিচ্ছি আঘাত করছি, কিন্তু যদি জানতে তার কতগুণ আঘাত আমার নিজের সইতে হচ্ছে…'

'তবে এস বিভা আমরা আবার আগের মত হই, সেই যেমন বিয়ের আগে আমরা এক নিবিড় মিলনের আনন্দে ডুবে যেতুম আবার তেমনি করে যাই। কাজ নেই আমাদের জ্ঞানবিচারে, প্রেমের আলোয় আমরা পথ চলব। এস বিভা আমাদের এই একলা অন্ধকার ঘরে দুই আত্মার নিবিড় মিলন শুধু সত্য হোক্, বিশ্ব রসাতলে যাক, আমাকে ডুবিয়ে দাও ডুবিয়ে দাও তোমার মধ্যে'—বিভার সমস্ত তর্ক ভুলে একটা অন্ধ আবেগে ভেসে চলল নিশিকান্ত।

গভীর মমতায় স্বামীর একখানা হাত টেনে নিল বিভা, কোনো কথা না ব'লে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো তার ওপর। এ মৌন কিসের লক্ষণ ঠিক বুঝতে পারল না নিশিকান্ত। সম্মতির—না অসম্মতির ?

'সেই গানটা গাও নাগো! অনেকদিন যেন শুনিনি—তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি ধাই, কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই…' অনেকক্ষণ নীরবতার পর বললে বিভা।

এত মৃদু, ভাবগভীর ওর কণ্ঠ, মনে হল কতদূর থেকে যেন বললে কথাগুলো।

'আমি গাইতে পারছিনে বিভা!'

নিশিকান্তর অস্ফুট কণ্ঠ শুনে চমকে উঠল বিভা। পিছন ফিরে চেয়ে বললে—'দাঁড়িয়ে আছ কেন? এস এখানে বস।' টেনে ওকে পাশের চেয়ারে বসাল সে।

'গাও ওই গানটা গাও, শান্তি পাবে, আমি তো পাই...'

কিছু একটা জবাব দিতে চাইল নিশিকান্ত। কিন্তু গলায় কী যেন একটা আটকে গেল।

দশ

'বৌদি !'

চেনা কণ্ঠের ডাক শুনে বিভা মুখ তুলে চাইল।

'কী ব্যাপার শঙ্কর ? এতদিন পরে ?—সেই যে গেলে আর কোনো পাত্তা নেই...'

'আমি তো ভবঘুরে। কিন্তু তোমাদের খবর কী—সব ভালো তো ? দাদা কোথায় ?'

'তোমার দাদা একটু বাইরে গেছেন। বাইরেই তো আজকাল থাকেন কিনা বেশী।'

একটু থম্‌কে থেকে শঙ্কর বললে—'কী হয়েছে বলতো বৌদি ? মামীমার সঙ্গে কথা বলতে গেলুম, তা' দেখলুম কীরকম চেহারা, কথা বললেন আনমনে, হাসলেন তা' যেন জোর করে হাসা। আবার তোমারো দেখছি এই ভাব, দাদাও বলছ আজকাল বাইরেই থাকে, এসবের মানে কী ?'

'মানে বোঝা কি এত কঠিন শঙ্কর ? আমাদের জীবনে আর সঙ্গতি নেই, ঘটেছে বিচ্ছেদ...।'

'কিন্তু কেন ? সেটাইতো আমার প্রশ্ন।'

'আশ্চর্য। তুমি এই প্রশ্ন করছ ? তোমার সেই কথাগুলো কি তুমি একেবারে ভুলে গেছ শঙ্কর ?—সেই কথাগুলোই তো একটা প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে আমায় জাগিয়ে দিলে। নইলে আজ তো এই সংসারের স্রোতেই আমি ভেসে যেতাম। তুমি যদি না আসতে শঙ্কর, তবে আজ আমার জীবনের গতি হত সম্পূর্ণ আলাদা। এমন রূঢ় করে এমন কঠিন করে সত্যকে তো জানতে পারতাম না কোনোদিনই...'

'বৌদি তোমার সমস্ত চেহারায়—কথার সুরে—যেন একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে মনে হচ্ছে। শেষ যেদিন আমি তোমার

সাথে দেখা করে গিয়েছিলুম—সেদিনের তুমি আর আজকের তুমি—যেন আকাশ পাতাল তফাৎ…'

'সত্যিই শঙ্কর।' বলে অন্যমনে খানিক চুপ করে চেয়ে রইল বিভা জানালার বাইরে। তারপর একসময় হঠাৎ বললে—'আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে, শঙ্কর?'

চম্‌কে শঙ্কর বললে—'তোমাকে নিয়ে যাব? কোথায়?'

'পথে। আমাকে অনেকদূর নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দাও শঙ্কর, পথের মধ্যেখানে—যে পথে তুমি চলো—রুক্ষ, বন্ধুর, বিপদ্‌সঙ্কুল—'

'আরেকটু স্পষ্ট করে বল বৌদি—'

'এই কারাগার থেকে মুক্তি পেতে চাই শঙ্কর। আমাকে টেনে নাও তোমাদের কাজে। জানি আমি দুর্বল, অক্ষম, ভীরু, কোনো কিছুর গর্বই নেই আমার। তবু তোমাদের কাজে সামান্যতম অংশও যদি আমি গ্রহণ করতে পারি তাই আমাকে দাও শঙ্কর। দেশের যে এমন একটা সুতীব্র আহ্বান আছে আগে তো আমি কখনো অনুভব করিনি—তুমিই আমাকে তা' প্রথম শোনালে। তুমি আমাকে জাগিয়েছ—তুমিই আমাকে পথ দেখাও…'

বিভার আকুলতায় আশ্চর্য হল শঙ্কর।

'শেষ পর্যন্ত সইতে পারবে তো? শুধু ভাবাবেগের ওপর কোনো কাজ করা উচিত নয় বৌদি—' চিন্তিত সুরে বললে শঙ্কর।

'শঙ্কর, আজ আমি যা' অনুভব করছি তা' ভাববিলাস নয়। এ সত্য, সত্য, সত্য। আমার বেদনা কেউ বোঝে না—তুমিও যদি না বোঝো—'

'আমাকে একটু ভাবতে দাও বৌদি।' চিন্তান্বিতভাবে বিভার ঘর ছেড়ে তেতালার ছাতের দিকে পা বাড়ালো শঙ্কর।

এগার

'দেখ, শঙ্কর এসেছে, ও তো কলকাতা হয়েই যাবে। তা' আমি ওর সঙ্গে ওই পথে বাবার কাছে যাব একটু, ফিরবার সময় তুমি নিয়ে এস।'

বিভার কথা শুনে চিঠি লেখা বন্ধ করে মুখ তুলে চাইলো নিশিকান্ত। 'ছু'দিন পরে গেলে হত না? আমারই তো একটা কাজ আছে কলকাতায়। এই দেখ যে বন্ধুকে চিঠি লিখছি ওর সঙ্গেই দরকার। একেবারে এক সঙ্গেই যেতাম...' বলে যে দৃষ্টিতে নিশিকান্ত চাইলো বিভার দিকে—তাতে বেদনা, অনুনয়, অসহায়তা —সব কিছু মিশে ছিল। এক মুহূর্তের জন্যে বিভার সমস্ত সঙ্কল্প ভেসে যেতে চাইলো। সমস্ত হৃদয় ওর বলে উঠতে চাইলো— 'সেই তো ভালো, ছুজনে একসঙ্গে যাব। এ ছু'দিনের বিচ্ছেদজ্বালা সব ধুয়ে মুছে যাবে আমাদেব ছুজনেব নিবিড় মিলনে! আমরা হব অবিচ্ছেদ্য—এক।' কিন্তু না। কঠোরভাবে হৃদয়কে শাসন করল বিভা।

'দেখ, আমার এখুনি যাওয়া দরকার। শঙ্করকে বলেছি যে ওর সঙ্গেই যাবো। আর বেশীদিন তো ওখানে থাকব না, খুব জোর চোদ্দ-পনেরো দিন...'

'তাই যেও। টাকা পয়সা যা' দরকাব থাকে আমার ওই স্যুট্‌কেস্‌টা থেকে নিয়ে নিও, ওতে কিছু টাকা আছে...'

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ওর বুকের কাছে উঠে আসছিল, সেটাকে প্রাণপণে দমন করল নিশিকান্ত। কলমটা তুলে অনেকক্ষণ ধরে সে চেয়ে রইল জানালার বাইরে—যেখানে ছুটো রক্তকরবীর ঝাড় উঠেছে প্রায় জড়াজড়ি করে—গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবী ছুলছে সবুজ ডালপালার মাথায়। জানালার কাছে গিয়ে হাত

বাড়ালে অনায়াসেই ফুল তোলা যায় ওখান থেকে, এমনি কতদিন সে তুলে তোড়া বেঁধে উপহার দিয়েছে বিভাকে…। নিশিকান্তর দৃষ্টি অনুসরণ করে বিভার চোখও গিয়ে থম্‌কে গেল ওই রক্তকরবীর দলে। ওই ফুলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত জ্যোৎস্নাব্যাকুল সন্ধ্যা আর বর্ষণক্ষান্ত রাতের স্মৃতি! অনেক—অনে-ক কথা ওর বুক ঠেলে উঠছে। কিন্তু কী করবে বিভা! ও যে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে তা' স্বামীকে বোঝাবার মত শক্তি ওর নেই। যাই কেন সে আজ বলুক—যে ভাষাতেই বলুক—নিশিকান্ত ওকে ভুল বুঝবেই বুঝবে। নিঃশব্দপায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল বিভা। দ্বারপথে একবার ক্ষণেকের জন্যে থম্‌কে দেখলে নিশিকান্তর মুখ—সম্পূর্ণ আত্মনিমগ্ন—কোনোদিকে লক্ষ্য নেই।

* * *

—'বিভা, দিন কয়েকের জন্যে আমি কলকাতা যাচ্ছি, একটা বিশেষ দরকারে—'

'ক'দিন থাকবে?'

'তা' এই দিন দশেকের বেশী লাগবে না!'

'দ—শ দিন! আমি তাহলে মরে যাব। অতোদিন আমি ছেড়ে থাকতে পারব না, আমাকে নিয়ে চলো—'

'মা-বাবা কী মনে করবেন বিভা? আমারও তো কষ্ট হবে, কিন্তু কী করব বলো, কাজ রয়েছে—'

'যেতে কি হবেই?'

'যেতেই হবে।'

'কবে যাচ্ছ?'

'এই পরশুদিন।'

'ঠিক আছে। দুটো টিকিট্ কাটতে বোলো। আমি অনেক দিন বাপের বাড়ী যাইনি, মাকে বলব, মা রাজী হয়ে যাবেন—'

'তুমি যাবেই ?'

'যাবোই। যদি না যাই তবে তোমার যাওয়াও হবে না জেনে রেখো।'

জেদী মেয়ের মত পা ফেলে ঘরের বার হয়ে যায় বিভা। হাসি মুখে দরজার দিকে চাইলো নিশিকান্ত, ওর চলে যাওয়ার ভঙ্গিটা দেখবার জন্যে—

শূন্য ঘরটা অসীম রিক্ততায় খাঁ খাঁ করে উঠল নিশিকান্তর চোখের সামনে। উঃ! কী জীবন্ত স্মৃতি! ঠিক যেন স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ—মনে হচ্ছিল সবকিছুই সেই ঘটছে চোখের ওপর। —এত বাস্তব যে নিশিকান্ত সেদিনের মতই কৌতুকভরা মন নিয়ে দেখতে গিয়েছিল কী ভঙ্গিতে বিভা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। কিন্তু কোথায় বিভা ? কখন চলে গেছে জানতেও পারেনি সে।

বারো

'নিশা, বাবা, তুই কি ঘুমোবিনে? রাত যে অনেক হল। রোজই এমনি করে জানলার ধারে বসে রাত কাটাবি? এমন করলে শরীর টিকবে কেন বাবা?' —কিরণময়ীর কণ্ঠস্বর সজল, করুণাছলছল। অন্ধকারে মাথার ওপর মায়ের হাতের স্পর্শ অনুভব করল নিশিকান্ত।

'মা, তুমি কেন জেগে আছ? আমার ঠাণ্ডা হাওয়াটা ভালো লাগছে ব'লে এখানে একটু বসে আছি, তুমি শোও গিয়ে মা। রাত জাগলে তোমার শরীর খারাপ হবে।' বললে নিশিকান্ত।

'আমি তো বুড়ো হয়েছি, মরলেই কি আর বাঁচলেই কি! কিন্তু তোর এ অবস্থা আর চোখে দেখতে পারিনে নিশা……। নিশা, বাবা, উনি বলছিলেন আইনে তুই ওকে ছেড়ে দিয়ে আবার বিয়ে করতে পারিস, তাই কর্না বাবা। আমি বুঝছি আমার কথায় তুই আঘাত পাচ্ছিস, কিন্তু ওকে ভুলতে হলে এছাড়া আর কোনো পথ নেই বাবা। যে আগুন তোর বুকের মধ্যে রাত্রিদিন জ্বলছে তা' যে তোকে নিঃশেষ করে ফেলছে নিশা, মা হয়ে কেমন করে আমি দেখব বল্। নিজের যন্ত্রণা যা আছে তা তো আছেই, তার ওপর তোদের কষ্ট—এ আর সইতে পারিনে বাবা, তিলে তিলে এ মৃত্যু যন্ত্রণা……'

'মা, তোমাকে একটি কথা বলব কিছু মনে করবেনা বল?'—মায়ের শীতল ডান হাতখানার ওপর মুখ রেখে শিশুর মত সরল কণ্ঠে বললে নিশিকান্ত—'আচ্ছা মা, মনে কর তোমার বিয়ের ক'দিন পর যদি আমার বাবা তোমায় ছেড়ে চলে যেত, তুমি কি আর কাউকে স্বামী বলে মনে করতে পারতে? আমি তোমাকে অপমান করবার জন্যে বলছিনে মা, আঘাত দিতেও নয়। শুধু এই জন্যে যে

তোমার তখনকার মনের অবস্থা দিয়ে আমাকে বুঝবার চেষ্টা কর।'

'আমরা যে মেয়েমানুষ বাবা, আমাদের কাছে স্বামী তো একজন পুরুষমাত্র নয় যে তাকে বদল করা চলবে। সে যে আমাদের দেবতা, তাকে আমরা পুজো করি, দেবতা যত দুঃখই দিক্ তাকে কি ছাড়া যায় বাবা?'

'তবে সেও আমার দেবী মা, এ প্রগল্ভতা নয়, এ সত্য। তাকে আমি পূজা করি মা—হ্যাঁ এখনও করি। তার সঙ্গে তর্কবিতর্ক খিটিমিটি অনেক ঘটেছে, আমি চেষ্টাও করেছি তাকে বেঁধে রাখবার। আমার আত্মাভিমানই তাই করিয়েছে। কিন্তু তবু আমি জানি যে অপরাধ তার কোথাও নেই। সে সাধারণ মেয়ে নয়, আমাদের দৈনন্দিন চাল-নূন-তেলের হিসেবের মধ্যে তাকে ধরা যায় না। সে তার সত্যকে—তার ভগবানকে ত্যাগ করেনি—তাকে অস্বীকার করে নিয়ত সংসারের সঙ্গে অভিনয় করে চলেনি। সেকি অপরাধ মা? আমাদের সঙ্গে তার পথ মেলে না, জোর করে মেলালে সেই যে হত সবচেয়ে চরম অন্যায়, জগতের কোথাও কোনোখানে তার আর মার্জনা থাকত না! হয়ত এ ভালোই হয়েছে মা যে ভগবান্ এই দুঃখের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে এপৃথিবীতে শুধু তাঁর সঙ্গেই আমাদের যোগ একমাত্র সত্য, আর আমরা কেউ কারো নই, প্রত্যেকেই আপন আপন পথে আপন আপন ভাবে তাঁকে লাভ করব!'

'কিন্তু নিশা, সে যে এই এতজনকে এমন আঘাত দিয়ে গেল, এও কি ভগবান সমর্থন করেছেন? মানুষের ভালোবাসায় কি ভগবান নেই, সেখানে কি কোনো সত্য নেই—যা হয়তো তর্কে বুঝিয়ে বলা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়? যদি মিলতেই পারবে না তবে সে তোকে বিয়ে করলে কেন? আর চলে গেল

তাও একলা নয়, শঙ্করের সঙ্গে, যাতে ঘরে-বাইরে আর আমাদের মুখ দেখাবার উপায় রইল না। আর যদি তুই বলিস যে এ সংসারে সবচেয়ে বড় শুধু নিজের পথে চলা, ভালোবাসা তুচ্ছ, তবে বল্ তুই কেন তাকে আজো হৃদয়ে ধরে রেখেছিস যার সঙ্গে তোর পথ মেলে না? যার সঙ্গে তোর যথার্থ মিল সেই একজনকে তুই খুঁজে নেনা এ সংসারে—সেইখানে ভালোবাসাও তোর সার্থক হবে।'

'মা তবে আসল কথাটাই বলি। আমার পক্ষে যা সত্য তার পক্ষে তা নয়। তাব কাছে প্রেমের চাইতে কর্ম বড়, আমার কাছে প্রেমই সবচেয়ে বড়। কিংবা ঠিক তাও নয়। আমি যেটাকে সবচেয়ে বড় বলে মানি তাকে জীবন দিয়ে উপলব্ধি করবার শক্তি আমার নেই। তার আছে। সেজন্যেই তাকে আমি ভালোবাসি। তার এই চলে যাওয়া যদি কোনো সাধারণ মেয়ের পালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে এক হত, তবে আমি তাকে আজো এত ভালোবাসতে, এত শ্রদ্ধা করতে, পারতুম না মা।'

'তুই অনেক বই পড়েছিস্, বাইরে বেড়িয়েছিস্, তোর সঙ্গে আমি কথায় হয়ত পারব না নিশা। কিন্তু আমাদের মুখ চেয়ে তুই বিয়ে কর্, তাকেও একদিন ভালোবাসতে পারবি যেমন করে বিভাকে বেসেছিলি। আমি নিশ্চিত বলছি নিশা, আজ যা তোর কাছে এত কঠিন বলে বোধ হচ্ছে তাই একদিন তোর কাছে সহজ হয়ে যাবে।'

'মা তুমিও যদি আমাকে না বোঝো'—বেদনা ঝরে পড়ল নিশিকান্তর কণ্ঠে—'তবে কার কাছে আমি শান্তি খুঁজব মা? তুমি বলছ আমি অনেক বই পড়েছি, কিন্তু বুকের ব্যথা কোথায় বাজে তা শুকনো বইয়ের পাতায় কী লেখা থাকবে মা, সে জানেন শুধু অন্তর্যামী ভগবান।... এই আমি বেশ আছি মা, আমাকে শুধু তোমরা ক'দিন সময় দাও। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে, শুধু নিজের

সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করে নিতে হবে—সেই ক'টা দিন। তারপর আবার আমি যেমনকার তেমনি হব, তুমি যে সেই ছেলেবেলায় আমাকে সদানন্দ বলে ডাকতে সেই সদানন্দ নিশিকান্তকে আবার ফিরে পাবে মা!'

সদানন্দ! ওইনামেই তাকে আদর করে ডাকতেন কিরণময়ী। সত্যিই তো, ওর মুখে হাসি ছাড়া বিরক্তি কোনোদিন দেখেছেন বলে মনে পড়ে না তাঁর। রাগ, দুঃখ অভিমান, কখনো সহজে প্রকাশ পায় না ওর কথায়, ওর ব্যবহারে। সেই ছেলেকে মেয়েটা এমন আঘাত দিয়ে গেল! ভগবানের বিচার বটে! তবু ছেলেটা একবার ভুলেও দোষ দেবে না মেয়েটাকে, পুরুষ-মানুষ হয়ে এমন কেন হল নিশিকান্ত? কিরণময়ীর হৃদয় বিদ্রোহ করে। না, এ অনাচার, এ অন্যায়, ছেলে সইলেও তিনি সইতে পারবেন না। প্রতিশোধ চাই—প্রতিশোধ, ও মেয়ে জানুক তাকে ছাড়াও সংসার চলে—আরো ভালোভাবেই চলে। এত স্নেহ, এত সেবা, এত যত্ন, তার এই প্রতিদান!

তেরো

'নিশিকান্ত, ও নিশিকান্ত, আরে এদিকে শুনে যাও না!'—বৈঠকখানা থেকে হাঁক দিলেন ভৈরব আচার্য্য। ভদ্রলোক গ্রামের বিশিষ্ট প্রবীণ এবং নিশিকান্তের পিতৃবন্ধু, কাজেই নিশিকান্তকে থামতে হল।

'বলি এত সকালবেলা হন্‌হনিয়ে যাচ্ছ কোথা মাঠের দিকে? —এস, বস, একটু গল্প করে যাও।'

'আজ্ঞে আমার পাঠশালার ছেলেরা—'

'আরে রেখে দাও ওসব। পড়ে তো লাট্-বেলাট্ হবে,—যতো সব ছোটলোক! বলি তোমার মত ভালো ছেলেও কী করে ওই নিয়ে রাতদিন হৈহৈ করে বেড়ায় ভেবে পাইনে! অবিশ্যি আমি জানি এসব তোমার নিজের নয়, অন্য কারো প্ররোচনাতেই হচ্ছে, তা যাই হোক বাবা তুমি ওসব খপ্পরে যেও না। জানতো ওরাই সব দু'দিনবাদে লালঝাণ্ডা নিয়ে তোমারই দোর ভেঙে ডাকাতি করবে, তোমারই মাঠের ফসল তুলে নিয়ে যাবে গায়ের জোরে। যার খাই তার পোড়াই,—দুধ দিয়ে কাল সাপ পোষা! আরে বাবা ছোটলোক, না আছে জাতজন্ম, না আছে শিক্ষে দীক্ষে। দু-পাতা ক-খ পড়লেই কি ধর্মজ্ঞান হয়। ও যে রক্তের জিনিস, বংশ পরম্পরায়…এস বাবা, ভেতরে এস, তুমি তো ঘরের ছেলে—'

অগত্যা নিশিকান্তকে ভিতরে গিয়ে বসতে হল।

'শিবু, ও শিবু, তোব নিশিদাকে জল খেতে দে'—বড় মেয়ে শিবানীর উদ্দেশে বললেন আচার্য-মশাই।

শিবানীর নাম শুনে মনের মধ্যে কেমন সঙ্কুচিত অনুভব করে নিশিকান্ত। অতীতের একটা চাপা-পড়া অধ্যায় ওর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ছেলেবেলা থেকে আচার্য্য পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা

ছিল নিশিকান্তদের। আচাজ্জি বাড়ীর মেয়েরা প্রায়ই আসত রায়বাড়ীর অন্দরমহলে আসর জমাতে। মেয়েদের এই হাসিখেলা গালগল্পের মধ্যে দিয়ে উভয়পক্ষের মনে বাসা বেঁধেছিল একটা ছোট্ট মধুর আশা, নিশিকান্তর সঙ্গে শিবানীর বিয়ে হবে, দুই পরিবারের সাময়িক বন্ধুত্ব পরিণত হবে স্থায়ী রক্ত-সম্পর্ক ও আত্মীয়তায়। নিশিকান্ত যখন কৈশোরে পদার্পণ করল তখন এই ছেলেবেলা থেকে শুনে আসা কথাটা একটা গল্পের মত স্থান পেয়ে গেল ওর মনে, ওর কল্পনার জগতের এক কোণে। কিন্তু তার সঙ্গে ওর সত্যিকার বাস্তব মনের কোনো যোগ ছিল না। শিবানীকে দেখে একমাত্র শিশুকালীন বন্ধুত্ব ছাড়া আর কোনো মনোভাব তার কোনোদিন জাগেনি। ···বিভাকে যখন বিয়ে করে নিয়ে এল নিশিকান্ত তখন আচার্য্যবাড়ীতে একটা ঝড় উঠেছিল। বহুদিন পর্যন্ত আচাজ্জিদের মেয়েরা এ বাড়ীতে আর পা দেয়নি। পুরুষরাও না। একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান আর অভিযোগ রয়ে গিয়েছিল ওদের ব্যবহারে।

'এই যে বাবা, নাও, খাও, তোমার খুড়ীমার হাতে গড়া চন্দ্রপুলি—তোমার জন্যেই করেছে। কালই বলছিল—হ্যাগো নিশিকে একবার ডেকে নিয়ে এসো, দুটো হাতের মিষ্টি খাওয়াই। আহা সেই ছেলেবেলায় যখন তখন আসত আমাদের বাড়ী, আমার হাতের রান্না খেতে বড় ভালোবাসত। বলি তুমি তো আর পর নও আমাদের, ঘরেরই ছেলে···'

মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে নিশিকান্ত। এত আদর কেন? বিভাকে বিয়ে করার পর থেকে ওঁরা তো প্রায় বাক্যালাপই ছেড়ে দিয়েছিলেন তার সঙ্গে। আজ এতদিন পরে আবার এমন করে ঘরে ডেকে এনে এত যত্ন আদর···

'খেয়ে নাও বাবা, আমি আর শিবু কাল সারাদিন বসে বসে

করেছি'—আচার্যগৃহিনী আবির্ভূতা হলেন দোর-গোড়ায়—'ওই যে ক্ষীরের ছাঁচ আর চন্দ্রপুলি ও শিবুই করেছে। কাজেকম্মে অমন মেয়ে হয় না বাবা আজকালকার দিনে। গলায় উঁচু কথাটি কেউ শোনেনি কোনোদিন, যেমন রূপ তেমনি গুণ। তোমাকে আর কী বলব বাবা তুমিতো জানই, ছেলেবেলা থেকে ওকে দেখছ। কিন্তু বাবা একটা ভালো পাত্র পাচ্ছিনা যে অমন মেয়ের বিয়ে দিই……'

'আচ্ছা আমি চেষ্টা করব যথাসম্ভব, যদি সন্ধান পাই বলব আপনাদের'—গলা ততক্ষণে শুকিয়ে এসেছে নিশিকান্তর।

'সন্ধান আর দূরে কোথায় করবে বাবা, ঘরেই এত ভালো পাত্র রয়েছে যখন…। আর জানইতো বাবা তোমার মায়েরও ইচ্ছে ছিল আমারো ছিল সেই যখন ছেলেবেলায় তোমরা দুটিতে খেলে বেড়াতে তখন থেকেই—'

'কিন্তু আমি তো বিবাহিত, একাধিক বিয়ে তো ধর্মতঃ আইনতঃ কোনোদিক দিয়েই এখন আর চলেনা খুড়ীমা—'মরীয়া হয়ে বলে ওঠে নিশিকান্ত।

'আইনে কোনো বাধা নেই বাবা, অনায়াসে তুমি জিতে যাবে। যে বউ পরপুরুষের সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালায়,—মাগো কী ঘেন্না, তাও আবার দেওরের সঙ্গে, ছিছিছি…'

'বিভা আর শঙ্করের মধ্যে সেরকম কোনো সম্পর্ক ছিলনা খুড়ীমা। ওরা গেছে আদর্শের জন্যে—আমি খুব ভালো করেই জানি।'—মুখচোখ রাঙা হয়ে ওঠে নিশিকান্তর।

ভৈরব আচার্য্য হাজার হলেও পুরুষ, সাংসারিক চাতুর্য্য তাঁর গৃহিনীর চেয়ে বেশী, তাই তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন—'না বাবা না, সেকথা নয়, সেকথা কেউ বলতে পারে! আমরা জানি সে কীসব পার্টি ফার্টির জন্যেই গেছে, আর শঙ্করও ওইসব করত। তা' সে

যেজন্যেই যাক্‌, সে যখন স্বেচ্ছায় তোমাকে ত্যাগ করে চলে গেছে, সে আর অধিকার খাটাতে আসবেনা, আদালতেও তুমি সহজেই ডিক্রী পেয়ে যাবে।······আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি বাবা, শিবু তোমাকে কখনই অসুখী করবেনা, এত লক্ষ্মী মেয়ে···'

'শিবু খুব ভালো মেয়ে আমি জানি কাকাবাবু। কিন্তু ধর্মতঃ বিবাহ মানুষের একবারই হয় বলে আমার বিশ্বাস। আমার পক্ষে দু'বার বিবাহ করা সম্ভব নয় কোনোমতেই। বিভা যেখানেই থাক, যাই করুক, সেই আমার স্ত্রী, সেই আমার সহধর্মিণী। সে মারা গেলেও আর কাউকে স্ত্রী বলে আমি মানতে পারব না কোনোদিন।' কথা ক'টা বলেই উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করে নিশিকান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুতপায়ে, একবারও পিছন ফিরে তাকালো না।

আনমনে কতক্ষণ যে হেঁটেছে খেয়াল ছিল না, হঠাৎ চোখে পড়ল সামনেই রূপনারায়ণের জল। এতদূর এসে পড়েছে সে? ওদের গ্রাম তো নদী থেকে খুব কাছে নয়, মাইল তিনেক তো হবেই। যাক্‌, ভালোই হয়েছে। এই নির্জন নদীতীরে আর কেউ বিরক্ত করতে আসবে না তাকে।

সারি সারি গাছের ছায়ায়, এই নিরালায়, গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো সে। একটা বড় তেঁতুলগাছের ছায়ায় বসে নিজেকে ছড়িয়ে দিলো নিশিকান্ত। সকালবেলাকার ঠাণ্ডা বাতাস বইছে ঝিরঝির করে, ঝিলঝিলে কচি-সবুজ তেঁতুলের পাতা দুলছে—গুচ্ছ গুচ্ছ। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় ঝরে পড়ছে ছোট ছোট তেঁতুল ফুলের পাপড়ি নরম ঝুরঝুরে মাটির বুকে, লাল ধুলোয় লুটিয়ে লুটিয়ে মাখামাখি একেবারে। সামনে বালির চড়ায় জেলের দল ডিঙ্গিনৌকো ভাসাচ্ছে, বড় বড় কালোরঙের জাল হাতে গুটিয়ে নিয়ে তুলছে নৌকোর পাটায়। কতকগুলো ছোট ছেলেমেয়ে আর

স্ত্রীলোক শামুক আর কাঁকড়া খুঁজে ফিরছে বালুরাশি খুঁড়ে খুঁড়ে—চরের কিনারায় অগভীর জলে। অনেকে কাপড় কাচছে নদীর জলে, কেউ বাসন ধুচ্ছে, কেউ কাঁখে কলসী করে নিয়ে যাচ্ছে নদীর জল……। দূরে নদীর বুকে ভেসে-চলা ডিঙ্গিগুলোকে এখান থেকে দেখায় যেন কালো রাজহাঁসের মত।

বিভা চলে গেছে। সত্যিই চলে গেছে, জন্মের মত, তাকে ফেরাবার আর কোনো উপায় নেই। মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর এই বিচ্ছেদ, মৃত্যুর চেয়েও দুঃসহ এই ব্যবধান। অনেকদিন পরে আজ নিজেকে একলা পেয়েছে নিশিকান্ত, একান্তে। মা, বাবা, আত্মীয়-পরিজন বন্ধুবান্ধব, কেউ নেই এখানে। কেউ আসবে না ওর ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়টাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রক্ত ঝরাতে। প্রয়োজন নেই অন্তর্জ্বালাকে লুকিয়ে রেখে মোলায়েম হাসির ছদ্মবেশ পরে তৃপ্ত সুখী জমিদারতনয়ের অভিনয় কবার।

জীবনের জমাখরচের খাতাখানা খুলে একবার লাভলোকসানের হিসেবটা মিলিয়ে দেখতে বসল নিশিকান্ত।

এইমাত্র সে জোরগলায় ভৈরব আচার্য্যের বাড়ীতে বলে এল বিভাই তার একমাত্র সহধর্ম্মিণী। অথচ…যাকে নিয়ে তার এই অহঙ্কার সে তো স্বীকার করল না তাকে জীবনের সঙ্গী বলে। মুহূর্তের জন্যে ভাবলে না—যাকে ফেলে গেল পিছনে তার কী হবে? শুধু এগিয়ে চলা, পিছনে চেয়ো না, যারা রইল পড়ে তাদের দুর্বল বাহুর অবুঝ আলিঙ্গনকে নির্ম্মমভাবে দ'লে ছিঁড়ে ফেলে চলে যাও শুধু নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে…। নিশিকান্ত পারলে না বিভার পথে চলতে, বৃদ্ধ রুগ্ন পিতামাতার স্নেহ-সংস্কারে গড়া এই সংসারটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে নূতন সৌধ গড়তে পারলে না তার ধ্বংসস্তূপের বুকে, তাই বিভার কাছে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। আপনপথের সহায়ক ছাড়া আর

কোনোভাবে তো বিভা তাকে চায়নি। সে মরল কি বাঁচল, তাতে বিভার কী আসে যায়? গেলই বা তার জীবন বিধ্বস্ত হয়ে? না, তাকে ভালোবাসতে কোনোদিন পারেনি বিভা, মনে হয় নিশিকান্তর। আর নিশিকান্তের বাপ-মা? কিসের সম্পর্ক তাদের সঙ্গে!—স্বামীকেই যে একমুহূর্তে বিনাদ্বিধায় ত্যাগ করতে পারলে তার পক্ষে সে প্রশ্ন কি ওঠে? নিশিকান্তর মা, বাবা, বিভার তারা কে? একটা পড়্‌শীর সঙ্গেও যেটুকু মৌখিক ভদ্রতা বা সৌহার্দ্য রাখে লোকে বিভা তাও রাখেনি তার শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে। এ সংসারে শুধু সরাইখানায় আশ্রয়-নেয়া বিদেশী যাত্রীর মত দিন দুই কাটিয়েছিল বইতো নয়! প্রবাসীও যাবার মুখে বুঝি একটু ব্যথাবোধ করে তার ক্ষণিকের সঙ্গীদের ছেড়ে যেতে, সে তো তাও করেনি। তবু নিশিকান্ত নির্লজ্জের মত গর্ব করে বেড়ায় লোকের কাছে যে সেই তার একমাত্র সহধর্মিণী। সহধর্মিণী! গ্রামের সব লোক যে সামনে পিছনে বিদ্রূপ তামাসা করে তাকে নিয়ে, যথার্থই তার উপযুক্ত সে!

…'—আমার কী মনে হয় জানো? মনে হয় যেন কত জন্ম-জন্মান্তর, যুগযুগান্তর ধরে আমি তোমাকে ভালোবেসে এসেছি! —মনে হয় এ ভালোবাসার বুঝি আদি নেই অন্ত নেই, আমার সমস্ত জীবনমরণ অতিক্রম করে গেছে সে। আজ যদি আমি মরি কোনো দুঃখ নেই, এর পরে কত জন্ম ধরে কত বিচিত্র দেশে বিচিত্র পরিবেশে কত বিচিত্রভাবে আবার তোমাকে আমি ভালোবাসব!……হ্যাঁগো, একটা কথা তোমার বিশ্বাস হয়?—যে আমি যত দূরে—যত দূরেই থাকি না কেন, তোমার থেকে সমস্ত ইহজীবনে যদি বিচ্ছিন্নও হয়ে যাই, যদি মৃত্যুও হয় আমার, তবু আমাদের এ ভালোবাসা ধ্বংস হবে না কোনোদিন? অম্লান, অক্ষয়,—অনাদি অনন্তকালের সঙ্গে বয়ে চলবে এ প্রেমের ধারা…।

—...এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর

পুণ্য হল অঙ্গ মম ধন্য হল অন্তর,

সুন্দর হে সুন্দর।

এই তোমারই পরশরাগে চিত্ত হল রঞ্জিত

এই তোমারই মিলনসুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।

তোমার মাঝে এমনি করে নবীন করে লও হে মোরে

এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম জন্মান্তর...'

—গাইতে গাইতে সেদিন বিভা কেঁদেছিল, কাঁদেনি কি নিশিকান্তও?—উষ্ণ অশ্রুজলে ওর বুক ভেসে গিয়েছিল। একী! আজো যে তাই হচ্ছে। ছিঃ, ধিক্, শত ধিক্ নিশিকান্তকে। ঠিক, ঠিক, উপযুক্তই হয়েছে তার মত দুর্বল কাপুরুষের পক্ষে।......

...—এই জনমে ঘটালে মোর জনম জনমান্তর!

মাথায় ও কার স্পর্শ? শিউরে ওঠে নিশিকান্ত।—কই কেউ তো কোথাও নেই!—শুধু একগুচ্ছ তেঁতুলপাতা ঝরে পড়েছে ওর চুলে।

চৌদ্দ

'আমি আর হাঁটতে পারছিনে শঙ্কর—'

'আর বেশী দূর নয় বৌদি, মাইল তিনেক গেলেই আমাদের ডেরা। তোমার তো অভ্যেস নেই কিনা'—বললে শঙ্কর—'তাই কষ্ট হচ্ছে। নইলে আমি তো···আর এই রোদ্দুরটাতেই তোমার বেশী কষ্ট হচ্ছে।'

'আমাদের মহলে তো রোদের আঁচটিও লাগে না গায়ে। সব সময় সেই ছায়া ছায়া ঠাণ্ডা···' যেন আপন মনেই বললে বিভা।

চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় শুকনো রুক্ষ কঠিন পাথুরে পিঙ্গল মাটি। পায়ের তলায় তপ্ত, দগ্ধ পৃথিবী। এদিক সেদিক তাকায় বিভা। না একটা পুকুর, না একটা ঝোপ জঙ্গল। চলতে চলতে পথের ধারে হঠাৎ একটা শীর্ণ কুলের গাছ দেখতে পেয়ে ও থেমে যায়। ডালপালা বেশী নেই, তবু গাছটার তলায় দু' একজন বসবার মত একটুখানি ছায়া আছে। 'শঙ্কর, এখানে একটু বসি, নইলে পারছিনে!' বলতে বলতেই ও গিয়ে বসে পড়ে কুল গাছটার ছায়ায়। 'ওয়াটার বট্‌ল্‌টা দাওতো।' কাঁধে ঝোলানো জলের বোতলটা নামিয়ে দেয় শঙ্কর।

বোতলের জলটাও গরম হয়ে গেছে, খেতে গিয়ে দেখে বিভা। ওই জলই হাতে মুখে একটু ছিটিয়ে নেয় ও। তারপর গাছের গুঁড়িতে গা এলিয়ে দেয়। অগ্নিদগ্ধ ভূমির বুকের ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায় লাল ধূলোর ঘূর্ণী তুলে, তার তপ্ত ঢেউ এসে লাগে ওদের দেহে, মুখে। কেমন যেন অবশ লাগে বিভার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মনে হয় ক্লান্তিব শেষ সীমায় এসে পৌছেছে ও। মাইলের পর মাইল, দিনের পর দিন, অর্ধাহারে, রোদে পুড়ে এই অবিবাম পথ চলা ওর জীবনে এই প্রথম। বইয়ে পড়া মহাপুরুষদের বাণীগুলো

ওর শূন্য চেতনায় কোনো সাড়াই আর জাগাতে পারছে না বুঝি এখন! বিশ্রাম, বিশ্রাম চাই, বিশ্রাম……ক্লান্ত বিভার চোখ বুজে আসে।

ওর অবস্থা দেখে আর তাগাদা দিতে পারে না শঙ্কর। বিভার রক্তাভ পাণ্ডুর মুখের 'পরে এলোমেলো চুলগুলো খেলা করে দুপুর-বেলার তপ্ত বাতাসে। পাশে পড়ে আছে জলের বোতলটা, সামনে দু-একটা ঝরে-পড়া শুক্‌নো কুলের পাতা ঘুরতে ঘুরতে উড়ে চলেছে রাঙাধ্‌লোর ঝড়েব সাথে।

বেলা পড়ে আসে। স্তিমিত দিনের ম্লান আভা পড়ে দিগন্ত-স্পর্শী মাঠের সীমানায়। গাছের ছায়া দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া ভেসে আসে, প্রাণ-জুড়োনো বেলা-শেষের শীতল বাতাস।

'বৌদি, ও বৌদি, বেলা পড়ে এল, ওঠ।'

শঙ্করের ডাকে চোখ মেলে চায় বিভা।

'ওঠ এবার, অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছ, সন্ধ্যের আগে পৌঁছতে হবে।'

জলের বোতল আর ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় শঙ্কর।

* * *

গ্রামের একপ্রান্তে তাঁবু ফেলেছে শঙ্করের দলের ছেলেরা। জ্যোৎস্নারাত্রি বলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাইরে তালপাতার চাটাই আর খাটিয়া পেতে গল্প করে ছেলের দল। একখানা খাটিয়া বিভাকে একলা ছেড়ে দিয়েছে ওরা, এখানে যেটুকু সম্ভব আদরযত্নের ত্রুটি রাখেনি। বিভা ক্লান্ত, সত্যিই অত্যন্ত ক্লান্ত সে, নিজের কাছে একথা স্বীকার করতে তার লজ্জা নেই। দেহমনের ওপর দিয়ে যা অত্যাচার গেছে! অন্যে কী বুঝবে? যাক্‌, এখন শুধু বিরাম। ঘুম, ঘুমের চাইতে শান্তি আর কিসে?……কিন্তু ঘুম আসে না বিভার। মধুর আলস্যে হাত পা এলিয়ে দিয়ে খাটিয়ায় শুয়ে থাকে ও।

পূর্ণিমার প্রকাণ্ড রক্তাভ সোণালী চাঁদ উঠেছে অদূরে ডুমুর গাছটার মাথায়। মাঠ ঘাট প্রান্তর—ওই দূর বনভূমি—সব ভেসে যাচ্ছে শুভ্র কিরণের অজস্রধারায়। জোরালো বাতাস বইছে—হু-হু —কোন্ সাত সমুদ্র তের নদীর পারে অজানা দেশের স্বপ্নে মাতাল হয়ে ছুটছে…। তার বেগস্পর্শ বিভার মূর্ছাতুর দেহের তটে তটে বারবার শিহরণ জাগায়…।

দলের একটি ছেলে—তার নাম দেবব্রত—সবাই তাকে ধরেছে গান গাইবার জন্যে। খানিক পরে ছেলেটি গান ধরলে—

পাগল হাওয়া নিয়ে যায় মোরে কোন্ অচেনারি ধারে
যেথায় সকল কারাগার ভেঙে পথ হয়েছে রে !…

অনেক—অনেক দূরে চলে যায় বিভার মন। কোথায় রয়েছে তার স্বামী—তার প্রিয়তম—তার জীবনের সর্বপ্রথম এবং শেষ প্রেমিক। এমন করে ভালো তো আর কেউ তাকে বাসেনি, সেও তো আর কাউকে…। এ কথাটা আজ যত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ওর দৃষ্টির সামনে—আগে কখনো ওঠেনি। রাধানগরের বাড়ীতে যতক্ষণ সে ছিল, যতো ঝগড়া তর্ক আর কথাবন্ধই হোক না কেন, এমন দূরত্বের ব্যথা ওকে কখনো এভাবে বাজেনি সেখানে। বিচ্ছেদ—সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ—মান অভিমান নয়—ক্ষোভ দুঃখ রাগ নয়—কঠিন নির্মম বিচ্ছেদ। এ জীবনে নিশিকান্তর সঙ্গে হয়তো আর কখনো চোখের দেখাই হবে না…

যতো রুক্ষ ব্যবহারই সে করুক না কেন, স্বামীর কতকগুলি ছোট ছোট কাজ সে প্রতিদিন করত—কখনও একদিনের জন্যেও বাদ দেয়নি। এগুলির মধ্যে এমন একটি শান্তি—এমন একটি তৃপ্তি ছিল—যা শুধু মেয়েরাই অনুভব করতে জানে। সে যে নারী—যতই বিদ্রোহের চেতনা তাকে কঠিন করুক না কেন সে যে মেয়ে—এই কথাটা আজ যেমন মর্মে মর্মে অনুভব করছে আগে কখনো করেনি।

মনে পড়ে রাধানগরের বাড়ীতে থাকতে খুব ভোরে উঠে ও রোজ বাগান থেকে ফুল তুলে আনত, নিজের পছন্দমত রং বেরঙের ফুল, গাছের পাতা আর লতার গুচ্ছ দিয়ে সাজিয়ে দিত ঘর। সাদা পাথরের টেবিলের ওপর তুষারশুভ্র আধারে স্বচ্ছ জলের বুকে ভাসিয়ে রাখত বড় হলদে গোলাপের থোকা কিংবা স্থলপদ্ম। অদূরে দূপদানিতে জ্বল্‌ত সুগন্ধি ধূপ—সুরভিতে ভরে যেত ঘর। তারপর আস্তে করে নিশিকান্তর কাছে গিয়ে ওর চুলে সন্তর্পণে আঙুল বুলোত। এমনি করে সে রোজ ঘুম ভাঙাতো নিশিকান্তের। এখন কে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়? রোজ খাবার সময় বসে সে লক্ষ্য করত কোন্ বস্তুটি নিশিকান্তর ভালো লাগছে, কিসের পরিমাণ কম পড়ছে—সেই অনুসারে খাবার উপকরণ জোগাতো সে। নইলে তার স্বামী এমন মানুষ যে কিছুই খেতে না পারলেও মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলবেও না চাইবেও না। এমনিতর কত ছোট খাট কাজ ছিল তার বাঁধা। রাতের বেলা শয্যায় নিশিকান্ত শুয়ে পড়ার পর পায়ের কাছটিতে বসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত পায়ে হাত বুলিয়ে দিত সে···। ফোঁটা ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু গলে গলে পড়ে ওর দু'গাল বেয়ে।

ওর হৃদয়ের এই একান্ত গোপন ব্যথাটুকু কার কাছে ও প্রকাশ করবে আজ? ···একমাত্র শঙ্করই আজ ওর পথের সাথী—কর্ম্ম-জীবনের সহায়—অকৃত্রিম সুহৃদ্। কিন্তু শঙ্করও তো পারবে না এইখানে ওর ব্যথার ব্যথী হতে। বরং তাকে ঘৃণা—হ্যাঁ, ঘৃণাই হয়ত করবে শঙ্কর। এত তুচ্ছ কামনাও মানুষকে উতলা করে? —জানতে পারলে সমস্ত মেয়েজাতের ওপর বিতৃষ্ণাই বেড়ে যাবে তার। একদিন তো সে স্পষ্টই বলেছিল বিভাকে—'ঐ যে সব বলে না মেয়েরা লক্ষ্মী, ত্যাগ, সেবা আর কমনীয়তার প্রতিমূর্ত্তি—ওসব হচ্ছে বুজরুকী—আসল উদ্দেশ্যটা হল মেয়েদেরকে ক্রীতদাসীর

জাত করে রাখা। আর আমাদের মেয়েদেরকেও বলিহারি যাই। —তারা নিজেরা ওই দাসত্বকে রীতিমত সাধনা করে চর্চা করছে। একেক সময় সন্দেহ হয় বৌদি, দাসবৃত্তিটা মেয়েদের সহজাত…'

…'পাগল হাওয়া নিয়ে যায় মোরে কোন্ অচেনারি ধারে, যেথায় সকল কারাগার ভেঙে পথ হয়েছে রে!'—কিশোর কণ্ঠের উদাত্ত স্বর অনেক দূর থেকে যেন এসে আঘাত করে বিভার হৃদয়তটে। সত্যিইতো! যে পাগল হাওয়ার ঘূর্ণীস্রোতে ভেসে এসেছে সে এই জগৎপারাবারের তীরে—সে তো সংসারের সকল বন্ধন সকল কারগারকে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করেই আসে। চার দেয়াল ঘেরা অন্ধকারের নিভৃত নিবিড় মিলন সেখানে নেই—আছে শুধু রূঢ় দিনের আলোয় বিশ্বের রাজপথে অন্তবিহীন চলা। সেখানে শুধু যাত্রীদের উন্মত্ত কলরব আর সমস্ত বিশ্ব তার সামনে পড়ে আছে—অনাদি অন্তবিহীন বন্ধুর পথ। সেখানে নিশিকান্ত নেই, কিরণময়ী নেই, শশিকান্ত নেই,—সেখানে সে নামগোত্রপরিচয়হীন, স্বামী, বন্ধু, পিতা, মাতা, ভাই, বোন—কেউ না—কেউ নেই……

পনেরো

সন্ধ্যেবেলা ঘরের দাওয়ায় বসেছিল বিভা চাটাই পেতে। সারা দিনের কাজের পরে টনটন-করা হাত-পাগুলো মেলে দিয়ে বসে সে। শিরশিরানি শীতল হাওয়া বইছে—ঝোড়ো ঝোড়ো—দাওয়া ঘেঁসে ওঠা লেবু গাছের ছায়া থরথর কাঁপছে ছড়িয়ে পড়া জ্যোৎস্নার বুকে। নেবুফুলের নিবিড় সৌরভ ভেসে আসে—যেন কোন্ ফেলে-আসা স্বর্গের স্মৃতি·· ···।

আঙ্গিনার শেষে দরজার কড়া নড়ে ওঠে। উঠে গিয়ে দোর খুলে দেয় বিভা। দাওয়ার একপাশে জুতো খুলে রাখে শঙ্কর, তারপর চাটাইয়ের ওপর এসে বসে।

'সেই সকাল থেকে কোথায় বেরিয়েছিলে বলতো? খাওয়া-দাওয়া কিছু হয়েছে সারাদিনে, নাকি—?'

'না, খেয়েছি চিঁড়ে দই কিনে'—হাসল শঙ্কর।

'রাতের খাওয়াটা খেয়ে নাও এখনি, দেরী ক'রে আর কী হবে? খিচুড়ীটা গরম রয়েছে এখন—'

'দাও, দিয়ে দাও।' বলে উঠোনের কূয়োতলার দিকে যায় শঙ্কর, হাত-পা-মুখ ধুতে।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে তু'জনে এসে আবার বসে চাটাইয়ে। বিভা কোনো প্রশ্ন করে না, ওর কথা বলবার অপেক্ষায় চুপ করে থাকে। একটু পরে শঙ্কর ধীরে ধীরে বলে—'সেদিন তোমায় বলেছিলুম বৌদি, কণ্ঠপুরে একটা গ্লাস ফ্যাক্টরী হয়েছে নতুন—সেখানেই গিয়েছিলুম। ফ্যাক্টরী যেখানেই হবে সঙ্গে সঙ্গে জানবে ওই কুলিমজুরগুলোকে বর্বর পশু তৈরী করে জাহান্নামে দেবার রাস্তাও সঙ্গে সঙ্গে সাফ হচ্ছে সেখানে! —তাড়ি আর মদের কারবারীরা সঙ্গে সঙ্গে লাইসেন্স নিয়ে হাজির হবে সেখানে,—রক্ত

চোষা জোঁক! মদের সঙ্গে আসবে ব্যভিচার, কুৎসিৎ রোগ, যত রকমের জঘন্য পাপ—ব্যস্, সব খতম! যে নরকে এরা ডুববে তার থেকে টেনে তোলে এদের—কার সাধ্য! আর স্বয়ং কর্তারা তো তাই-ই চায়, যাতে চিরদিনের জন্যে এদের আত্ম-চেতনা চাপা পড়ে যায়, পাপের বিষে জর্জরিত হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে, কোনোদিন —কোনোদিন যাতে এরা আর মাথা তুলে সংগ্রাম করতে না পারে!'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দু'জনে। একসময় বিভা বললে— 'এর প্রতীকার কি কিছুই নেই, শঙ্কর?'

'হয়তো আছে। কিন্তু দুঃসাধ্য। চরম ধৈর্য আর প্রতীক্ষার প্রয়োজন, আর প্রয়োজন ত্যাগ। কে করবে সেই ত্যাগ? সবাই নাম কিনতে আর ইলেক্‌শন্ জিততে ব্যস্ত। সত্যিকার শক্তি সঞ্চিত হল কিনা সে নিয়ে মাথাব্যথা কার? শুধুমাত্র ক্ষণিক উত্তেজনা দিয়ে যে কোনো বড় কাজ হয় না সেকথা বুঝতে চায় কে? এই মজুর আর চাষীদের নিজেদের মধ্যে থেকেই যে নেতা তৈরী করতে হবে, চিরদিন এই দ্বিপন্থী বুর্জোয়া নেতৃত্ব দিয়ে চলবে না এদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো, সেকথা ভাবতে দায় পড়েনি এদেশের বামপন্থী নেতাদের। সত্যি করে তারা তা' আদৌ চায় কিনা সন্দেহ। কারণ তারা অন্য এক সমাজের লোক, শুধু জন্মের জাত নয়—মনের জাত দিয়ে দেখলেও তাই—মধ্যপন্থী পেটি বুর্জোয়া। বৈপ্লবিক শক্তি তৈরী হয় যে অ্যাটম্ দিয়ে তা' তারা নয়—হতে পারে না!'

'থাক এসব কথা।' —মৃদুকণ্ঠে বলে বিভা—'আজ তুমি ক্লান্ত, বিশ্রাম নাও। শুধু দেহের নয়, মনেরও বিশ্রামের প্রয়োজন আছে।'

'সত্যিই আমি বড় ক্লান্ত বৌদি।' কেমন এক অসহায় শিশুর ভাব ফুটে ওঠে শঙ্করের চোখে।

বিভার পিছন পিছন উঠে যায় সে ঘরের দিকে।

ষোলো

দাওয়ায় বসে বসে একখানা চিঠি পড়ছিল বিভা। শঙ্করের চিঠি। দিন দশের ওপর হয়ে গেল রাজস্থানের ওদিকে গিয়েছে শঙ্কর, ওখানকার দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। ঠিকানা কিছু দেয়নি, লিখেছে থাকা-খাওয়া-শোয়া কিছুরই নির্দিষ্ট জায়গা নেই। দু'জন কর্মীর কথা উল্লেখ করেছে শঙ্কর—ছোট্টুলাল আর সুলেমান খান্। 'আমার বিশ্বাস আমাদের দলের কর্মীদের মধ্যে এখন পর্যন্ত এ দু'জনই সব চাইতে সক্রিয়'—লিখেছে সে। চিঠিখানা রেখে দিয়ে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বিভা বসে রইল খানিক, আনমনে। আকাশ-পাতাল কত রকম চিন্তা যে মনে ভিড় করে আসে। সকাল বেলাকার রোদ্দুর চিক্‌চিক্ করে ডালিমফুলের গাছে, কুয়োতলায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া সিমেন্টের গাঁথ্‌নির ফাঁকে জমে থাকা জলের গায়ে শিরশিরিয়ে কাঁপছে টুকরো টুকরো আলো আর জামগাছের ছায়া।

একা একা সময় কাটে না। কী করা যায় ভাবতে ভাবতে বিভার হঠাৎ খেয়াল হয় এই কাছেই তো বিষ্ণুপুর, গিয়ে একটু ঘুরে এলে কেমন হয়? কখনো তো যায়নি সে। চিন্তাটা আসা মাত্র আর দেরী না করে টাকার ব্যাগ্‌টা হাতে নিয়ে দোরে তালা দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে স্টেশনের উদ্দেশে।

*　　　　*　　　　*

হাঁটতে হাঁটতে বিষ্ণুপুরের বাজারে এসে পড়ল বিভা। চারদিকে সে এক অভাবনীয় দৃশ্য, অন্ততঃ বিভার কাছে। কী একটা উপলক্ষ্যে আজ এখানে মেলা বসেছে, তাই চারদিক সরগরম। সারি সারি মূর্তি সাজিয়ে বসেছে দোকানদার আর ফিরিওলার দল পথের দু'ধারে। কতরকমের মূর্তি যে সাজানো পালিশ করা টেবিলের ওপর, ছোট কাচের আলমারীতে, জলচৌকী আর শতরঞ্চের ওপর। রং বেরঙের কাঠের মূর্তি—সাদা কালো ঘিয়ে

ব্রাউন, আরো কতরকমের মূর্তি—গালার, পাথরের, মাটির, তামার, পেতলের…। রকমারী রঙের আর ছাঁদের রাধাকৃষ্ণ, গৌর নিতাই, লক্ষ্মী, চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি, রুদ্র, কালী থেকে সুরু করে বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—আরো কত দেবদেবী আর মহাপুরুষের প্রতিচ্ছবি। আর বসেছে পশারীর দল কেউ তাঁবু খাটিয়ে, কেউ দোকানের সিঁড়িতে, কেউ পথের ওপরেই চাটাই পেতে। চন্দনকাঠ, পাথরের বাসন, তুলসীর মালা, পশমের আসন, বেতের ঝোড়া, কোষাকুষি, কমণ্ডলু, কড়ি, শাঁখ, যতরকমের সব পূজোর সরঞ্জাম। আরো আছে ধূপ, আবীর, শ্বেতপাথর আর চন্দনকাঠের বাক্স, ফুলদানি, পঞ্চপ্রদীপ, ধুনুচি, পিলসুজ থেকে সুরু করে রেশমী কাপড়, সন্দেশের ছাঁচ, মাদুর, কাঞ্চননগরের ছুরি, বঁড়শি, মাটির সরা আর মালসা। কিছু দূরেই বসেছে ফুলের মেলা—রাশি রাশি টাট্‌কা পদ্ম আর রজনীগন্ধা, বেলি, করবী, যুথী, দোপাটি, চামেলী, চাঁপা আর গন্ধরাজের ঐশ্বর্য। দু'পাশে শরবৎ আর খাবারের দোকান—সন্দেশ, চম্‌চম্‌, দই আর বাবড়ী সাজানো রয়েছে থরে থরে।

চলতে চলতে ছবির রাজ্যে এসে পড়ল বিভা। সুন্দর সাজানো দোকান থেকে থিয়েটারী ঢঙের মোলায়েম গলায় সেল্‌স্‌-ম্যান চেঁচিয়ে বলছে—'আসুন দিদি, এই যে এদিকে, একেবারে সাঁচ্চা মাল পাবেন। বাজারের সেরা জিনিসটি, সব চাইতে সস্তা দরে—'

দোকানগুলিতে ভীড় কিন্তু বেশী নয়। ভীড় যত ফিরি-ওলাদের সামনে। রাশি রাশি পট—বিচিত্ররকমের—কিনছে মেয়ে, পুরুষ আর শিশুর দল। থিয়েটারের রাম আর সিনেমার শ্রীকৃষ্ণের স্যাণ্ডাল্‌ পায়ে দেয়া ছবির ওপর সাগ্রহে ঝুঁকে পড়েছে ভক্ত ক্রেতা। বিধবা আর বুড়োবুড়ীর সংখ্যাই বেশী পড়ে চোখে। যেদিকে চাওয়া যায় বিপুল জনস্রোত। অদূরে দীঘির ঘাটের পাশ

দিয়ে মন্দিরের পথে পূজার্থী আর পূজার্থিনীর নিত্য আসা যাওয়া। কপালে বাহুতে গলায় চন্দনের ছাপ, হাসিখুশী মুখ, গলায় কণ্ঠীর মালা, হাতের সরায় পূজার ফুল আর নৈবেদ্য—দলকে দল আসছে যাচ্ছে। ওরি মধ্যে আবার দুটি অল্পবয়েসী ছেলে—মিশমিশে কালো তাদের গায়ের রঙ—রাধা-কৃষ্ণ সেজে নূপুর পায়ে নেচে নেচে লোকের কাছে দু'পয়সা রোজগার করে নিচ্ছে।

হঠাৎ বিভার চোখে পড়ল পথের থেকে একটুখানি দূরে—একপাশে একটু নিরিবিলি মত জায়গায়—একটা কদমগাছের তলায় একটি শীর্ণ প্রৌঢ় লোক—দেখলে মনে হয় যেন কতদিনের বুভুক্ষু—বসে আছে কয়েকখানি ছবি ছড়িয়ে চটের ওপর, তার চারপাশে কয়েকটি শিশুকঙ্কাল···। কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল বিভা।

'কী ছবি আছে আপনার কাছে ?—পট ?'

বিভার চেহারায় বোধ করি এমন কিছু ছিল যা' দেখে আশান্বিত হয়ে উঠ্‌ল লোকটি। অত্যধিক বিনয়নম্র স্বরে বললে—'আমার কাছে ভালো ছবি আছে দিদি, শুধু পট নয়, এই দেখুন—' বলতে বলতে একখানা ব্লক্‌ ছবির বই তুলে ধরলে লোক্‌টা। আগ্রহভরে বইটা হাতে নিয়ে খুলতেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল বিভা। বাংলা-দেশের ক্রমপরিণতির একটা জীবন্ত ইতিহাস ওর সামনে—সোনার বাংলা থেকে বাংলা মহাশ্মশান! সবুজে সোণায় আঁকা প্রথম ছবিটা দেখে ভ্যান্‌ গগ্‌-এর কথা মনে পড়ে গেল ওর। কোনো প্রথমশ্রেণীর শিল্পী ছাড়া এ-ছবি আঁকতে পারে না কখনও—মনে হ'ল বিভার। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলার সবুজ লাবণ্যে ভরা ধানের খেত্‌, তার মধ্যেখানে প্রায় ডুবে গিয়ে নাচছে একটি উলঙ্গ ছোট্ট শিশু,—মঞ্জরিত ধানের শীষের কোমল গুচ্ছ হাওয়ায় হাওয়ায় নুয়ে পড়ে চুম্বন করছে তার উলঙ্গ দেহ। তারপর এঁকেছে

শিল্পী অনাবৃষ্টি, মহামারী, দুর্ভিক্ষ—বাংলা মহাশ্মশান। শ্মশান—আগুন জ্বলছে এখানে সেখানে—ছেঁড়া মৃতদেহ—নরকঙ্কাল—আর জমাটবাঁধা রক্ত……। এখানেই কি শেষ? না। ইতিহাস তো এখানে থামে না। এরপরেও আছে আরেক অধ্যায়—সেই কথাই বলে জীবন—সেই কথা বলে ইতিহাস। তাকে অস্বীকার করেনি শিল্পী। তার শেষ ছবি মৃত্যু নয়—জীবন। শ্মশানের ধ্বংসস্তূপের থেকে জেগে ওঠা সৃষ্টির আদিম জয়গান। প্রত্যূষের প্রথম অরুণাভায় তরলায়মান অন্ধকারে দেখা যায় স্তব্ধ শ্মশানভূমির বিক্ষিপ্ত ভগ্ন নরকঙ্কালের পাঁজরা ভেদ ক'রে গজিয়ে উঠেছে ক'টি সবুজ ঘাসের পাতা—দীর্ঘ সতেজ।

'কে এঁকেছে এ ছবি?'—জিজ্ঞেস করলে বিভা।

'আজ্ঞে আমি—' বিনীত সুরে বললে লোকটি।

তাব বসে-যাওয়া চোখদুটিতে একটুখানি আশার আলো জ্বলে উঠ্‌ল যেন মুহূর্তের জন্যে,—মেয়েটি হয়ত কিনতে পারে বইটা। বইটা হাতে রেখে আবার লোকটির এবং শিশুকঙ্কালগুলির দিকে চাইল বিভা। নিমেষের জন্যে চারদিকের দৃশ্য যেন হারিয়ে গেল তার দৃষ্টির সামনে। শুধু ভেসে উঠ্‌ল কয়েকজোড়া জুল্‌জুল্‌-করা চোখ।—আশা-আশঙ্কায় স্পন্দিত অনেকগুলো প্রাণের বিশ্বব্যাপী আকুলতা দেখতে পেল ও।

'কতো দাম বইটার?'

'দশ টাকা।'—ভয়ে ভয়ে বললে লোকটা—'বউয়ের গয়না ঘরের জিনিসপত্তর যা' ছিল সব বেচে ব্লক্ করেছি কোনোরকমে—তাও এক ভদ্রলোক সাহায্য করেছেন—দশটাকা করেও কোনো লাভ থাকে না দিদি!'

দশ টাকা! ভ্যান্ গগ্ কিংবা টিশিয়ান্-এর পাশে দাঁড়াতে

পারে যে শিল্পী তার এতগুলো ছবির দাম মাত্র দশ টাকা। কিন্তু ......আর্টিস্ট্-এর এ-ইতিহাস তো নতুন নয়। দরদী শিল্পীর জীবনে সর্বদেশে সর্বকালে সেই তো একই নাটকের পুনরভিনয়।

ব্যাগ্ খুলে দশটা টাকা বার করল বিভা। বেশী টাকা নেই ওর কাছে। নইলে কিছু বেশী টাকাই দেবার ইচ্ছে ছিল তার।

লোকটির চোখে মুখে আনন্দ, কৃতজ্ঞতা উপ্চে পড়ল। বিভা বুঝল এ শুধু অর্থ-প্রাপ্তির আনন্দ নয়—মানুষের কাছে স্রষ্টা শিল্পীর আত্ম-মূল্যায়ণের পরিতৃপ্তি।

যত্ন করে একখানি কাগজে মুড়ে ছবির বইখানি বাঁধল লোকটি, তারপর বিভাব হাতে দিয়ে বললে—'দিদি, আবার আসবেন, কী দয়া যে করলেন...'

ছেলেমেয়েগুলো অবাক হয়ে চেয়ে রইল বিভার দিকে। তাদের দৃষ্টি দেখে মনে হল এই প্রথম বোধহয় তাদের বাবার আঁকা ছবি বিক্রী হতে দেখলে তারা বাজারে।

'আপনার নাম কী?'

'আজ্ঞে, ইন্দুভূষণ গুপ্ত।'

'পট আঁকেন না কেন? তাহলে বেশ বিক্রী হত আপনার এখানে...'

'আঁকি মাঝেসাঝে। কিন্তু ভালো লাগে না দিদি, ও রঙীন পটে কী আছে বলুন তো, এরা যে কিছুই বোঝে না'—বলে হরিনামের মালা গলায় দেয়া খরিদ্দারদের দিকে ইঙ্গিত করলে লোকটা—'সত্যিকার জিনিস দেখতে চায়না এরা, দেশ যে শ্মশান হয়ে গেল...' তার চোখে মুহূর্তের জন্যে একটা আগুন ঝল্‌কে উঠেই নিবে গেল।

শীর্ণ, ভিক্ষুকদশাগ্রস্ত লোকটার দৃষ্টিতে সেই পলকের জন্যে একটা জীবন্ত আর্টিস্ট্‌কে দেখতে পেল বিভা।

সতেরো

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। জনবিরল পল্লীর মেঠো পথের ওপর রাত্রির অন্ধকার নামছে ঘন হয়ে। পথের দুধারে ঝাঁকবাঁধা বনজলতার ঝোপে ঝোপে জোনাক্ জ্বলে····

খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘরে লণ্ঠনের লালচে আলোয় এসে একে একে জমায়েৎ হয় সবাই। বিভিন্ন জাতের—বিভিন্ন শ্রেণীর সব মানুষ। চাষী মজুর, শিক্ষিত অশিক্ষিত, গেঁয়ো শহুরে, সব ধরণের লোকই আসে···।

ঘরের মেঝেয়—একেবারে ঠিক মাঝখানে—লণ্ঠনটা জ্বলছে। তার আশেপাশে চারিদিকে খানিকদূর পর্যন্ত লাল আলো পড়েছে বৃত্তাকারে, তার বাইরে আব্ছা অন্ধকার। পুরোণো মাটির দেয়ালে ছায়া ঝুলছে দীর্ঘ···

'আমাদের গেরামে তো মশাই লোকের বাস করাই দায় হয়ে পড়েচে।'—সতু ঘোষই তোলে কথাটা—'যার যত জমি ছেল সব ঐ একা নাটু মোড়ল আর গণি মিঞা লোককে ধান, টাকা এসব ধারধোর দিয়ে কিনে ফেলেচে। তাই ওদের জমি চাষ না কল্লেও আমাদের গতিক নাই ; কিন্তু ওরা বলবেক কী যে চাষের সময় ধান ধার নিলে মনে পনেরো সের ক'রে 'বাড়ি' দিতে হবে—তাতে ইচ্ছে হয় আমাদের জমি চাষ কর্ নয় ছেড়ে দে! আবার কতায় কতায় কত চোক্ রাঙানি—বলবে আমার দু'গাড়ী কয়লা এনে দিতে হবে—নয় রলা এনে দিতে হবে বন থেকে—আর তাতে 'না' কল্লেই বলবে—আমার জমি ছেড়ে দে বলচি! তোর মতন ঢের ঢের কির্ষেণ্ আমার মিলবে যাঃ।'

'আরে সেই তো হয়েছে মুশকিল সব গাঁয়েই'—বলে সামাদ্ মিঞা। অনেক-দেখা অনেক-জানা মানুষ সামাদ্। জীবনের

বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আজ সে বুঝতে শিখেছে অনেক কিছুই। সতুর দিকে চেয়ে সে বলে—'এইসব মহাজনদের আবার ফন্দি কত। এরা নিজেদের নামে কিছু জমি রেখে বাকী সব স্ত্রীদের নামে, ছেলেমেয়েদের নামে বেনামী ক'রে রাখছে। সেজন্যেই তো আমরা চাই যে গাঁয়ের সব লোক মিলে জমি চাষ করবে, আর ফসল হলে তা' ভাগ করে নেবে সবাই যে যেমন খাটুনি দিয়েছে সেই রকম। গাঁয়ের সবাই হবে জমির মালিক, আর চাষের খরচ, সারের খরচ, জলছেঁচের খরচ—এসব চাপবে ঐ ফসলের ওপর—কাউকে একা বইতে হবে না! আর তাতে যদি খরচ না পোষায় —তার ব্যবস্থা করতে হবে গবর্মেণ্ট্‌কে। অবিশ্যি কোনো গাঁয়ের জমিজায়গা যদি খুব কম হয় তবে পাশাপাশি দু-তিনটে গাঁ মিলে একসঙ্গে চাষ করতে হবে।'

'তা'লে যে শালারা খাটবে না তারা ভাগ পাবে না!'—বলে সতু ঘোষ।

'আলবৎ! তবে বুড়ো, রোগী কি পঙ্গু লোকের কথা অবিশ্যি আলাদা। তাদের ভার নিতে হবে সারা গাঁ'কেই, কিংবা সরকারকে!'

ঝড়ু সর্দার এতক্ষণ চুপ করে ওদের কথা শুনছিল, এবার আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলে উঠ্‌ল—'সব্বাই দেখছি যে খালি কিরষেণদের নিয়েই মাথা ঘামায়। গাঁয়ে গাঁয়ে দেখছি কতকগুলো পার্টির লোক এরি মধ্যে ভোটের ধূয়ো তুলেছে—

জমির মালিক কারা?

ফসল ফলায় যারা!—

কিন্তু কোনো ব্যাটাকেই তো কৈ একবারও বলতে শুনিনি—

খনির মালিক কারা?

খাদে খাটে যা'রা!—

আমাদের ইউনিয়নগুলো তো দেখি শুধু দু'চার আনা মাইনে বাড়াবার ধুয়ো তুলেই চেঁচামেচি করে।'

'সেঁইখেনেই তো যোতো গোঁল্ হেঁ'—বলে উঠ্‌ল হরিপুর চিনি-কলের মজুর রামধন বাউড়ী—'কেঁনে কেউ বোলেনা। বোলোতো যে কোলে যারা খেট্যা মরে তারাই হোবে কোলের কোত্তা ?'

'ঠিক বলেছিস রামধন'—একজন সহমর্মী পেয়ে খুশী হয়ে ওঠে ঝড়ু সর্দার। উৎসাহিত হয়ে রামধনের সহকর্মী ব্রজ বাউড়ীও জোর গলায় বলে ওঠে—'আমরাও তোবে আখুন্ থিক্যা বোল্‌বো—

কোল্যার্ মালিক কা'রা ?
কোল্যার্ মজুর যা'রা।'

ব্রজ বাউড়ির এই স্লোগান বলার ভঙ্গি দেখে ঘরশুদ্ধ সবাই হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল। কিন্তু তাদের হাসি শেষ না হতেই ধানবাদের ফেলু ঘাটোয়াল গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলে—'তোমাদের কথাগুলো তো দেখছি সত্যিই ভেবে দেখবার মতন হে! তিরিশ বছর ধরে আমি ডুয়ার্স আর আসামের চা-বাগানে কাজ করেছি, টাকার লোভে কিছুদিন আড়-কাটির কাজও করেছি, আবার অনেক কুলী ইউনিয়নের সর্দ্দারিও করেছি। কিন্তু সামাদ্ মিঞার মতন কথা তো আর কাউকে বলতে শুনিনি কখনো'—

একটু ভেবে নিয়ে সে মাথা নেড়ে বলতে লাগল: 'যেমন ধান, গম, পাট, তামাকের চাষ, তেম্‌নি চায়েরও তো চাষ! তা' দল বেঁধে ফসল ফলালেই যদি সবাই মিলে জমির মালিক হওয়া যায় তবে চা-বাগানের কুলীরাই বা চিরকাল কুলী থাকবে কেন ? তারাই বা বাগানের মালিক হবে না কেন ?—'

'চা-বাগানের কথা বলছিলে তো ফেলু'—হাসতে হাসতে শঙ্কর এসে প্রবেশ করল ঘরের মধ্যে,—তার সঙ্গে একটি নতুন তরুণ

কর্মী। রাজস্থান থেকে শঙ্কর ফেরার পর এই প্রথম বৈঠক ওদের। তাই শঙ্করের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল। তার কথা শোনবার জন্যে সবাই উদ্‌গ্রীব।

'তুমি সত্যিই ভারী কঠিন প্রশ্ন তুলেছ ফেলু'—শঙ্কর বললে স্মিতমুখে—'এদেশের সব লোকেরই ধারণা চা-বাগানের কুলীদিকে চিরদিনই সেই দেড়হাত-উঁচু, স্যাঁৎসেতে খুপ্‌রীর ভেতর জোঁক আর এক ইঞ্চি ডাঁশ মশার মধ্যে কাঁথা পেতে শুতেই হবে। কাজে-কাজেই মদ, তাড়ি, গাঁজা, ভাঙ্, চরশ্—এসবও তাদের খেতেই হবে। কারণ, অন্ততঃ রাত্রিটার জন্যে নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা না পেলে মানুষে তো আর ওরকম ঘরে ঘুমোতে পারে না।'

'আচ্ছা শঙ্করদা'—নতুন কর্মীটি হঠাৎ প্রশ্ন করে—'শুনছি গভর্ণমেণ্ট্ নাকি আইন করছে যে গাঁয়ের কোনো চাষীই পঁচাত্তর কি ঐ রকম কত বিঘের বেশী জমি রাখতে পারবে না। তা' এতে যাই হোক, পাড়াগাঁয়ের লোকদের আয়ের একটা সীমা বেঁধে দেয়া হচ্ছে—অন্ততঃ মোটামুটিভাবে। কিন্তু শহরের লোকদের বেলা আয় বেঁধে দেয়া হবে না কেন? কল-কারখানার মালিক, ব্যবসাদার, সিনেমারাজ্যের ওই বড় বড় চাঁইগুলো, জাঁদরেল বাড়ীওলা, ব্যারিস্টার্, ঠিকেদার—এদেরই বা আয়ের একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকবে না কেন?'

'আরে তার উত্তর তো খুবই সোজা'—হেসে উঠল শঙ্কর—'সোস্যালিস্টিক প্যাটার্ণ্-এর পদকর্তারা তো বলেই দিয়েছেন যে গাঁয়ের চাষীদের 'জমির পরিমাণ' বেঁধে দিলেও তাদের আয়কে তো আর বেঁধে দেয়া হচ্ছে না!—যত ইচ্ছে আয় করুক না তারা তাদের ঐ ক'বিঘে জমি থেকে। কাজেই গ্রাম আর শহরের লোকদের মধ্যে কোনো পক্ষপাতিত্বই করা হয়নি!'

'কিন্তু—' ব'লে ছোক্‌রাটি আরো কী বলতে যাচ্ছিল, এমন

সময় ঝড়ের মত এসে ঘরে ঢুকল আধময়লা গেঞ্জি গায়ে একটি ছেলে, হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—'শঙ্করদা, শিগ্‌গির আসুন একবার—'

'কী হয়েছে রতন ?' উদ্বেগে উঠে দাঁড়ায় শঙ্কর।

'আমাদের পাড়ার সেই কিষণ পাঁড়েকে জানেন তো, আজকে কারখানা থেকে বেরোবার পর ওই শিলুটের ভাঁটিখানা থেকে মদে চুর হয়ে এসে ওর নুলো ছেলেটার পেটে এমন লাথি মেরেছে যে রক্তপেচ্ছাব হচ্ছে। কাছে-পিঠে ডাক্তারও নেই, আর পয়সাই বা দেবে কে, তাই আপনার কাছে ছুটে এলাম—' প্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে কথাগুলো শেষ করে রতন।

মুহূর্তমধ্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল শঙ্কর, রতনকে নিয়ে। ওদের সঙ্গ নিলে আরো কয়েকজন।

আঠারো

'বৌদি !'

'কী, বল।'

'জানো, আজ আমার সঙ্গে ঐ সুন্দরলাল আর তার সঙ্গে কর্তার্ সিং বলে একটা লোক দেখা কবতে এসেছিল।'—বললে শঙ্কর।

'কর্তার্ সিং—সে কে?'

'ঐ বিরজমল স্টীল্ ওয়ার্কস্-এর বোর্ড্ অব্ ডিরেক্টরস্-এর মেম্বার ও। সুন্দরলালের সঙ্গে ওর ভাগে মদের কারবার, শুধু এখানে নয়, বহু জায়গায়—'

'তা তোমার কাছে এসেছিল কেন?'

'এসেছিল'—রাতের তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে আপন-মনেই হাসলে শঙ্কর—'ওরা বলতে এসেছিল যে আমি যদি ওয়ার্কার্‌দের নিয়ে এসব হৈ-চৈ ছেড়ে দিই তবে ওরা আমাকে ওদের কারবারের অংশীদার করে নেবে বিনা মূলধনেই,—তাতে আমার লাভ হবে অনেক বেশী!'

'তুমি কী বললে?'

'বললুম আমার লাভ-লোকসানের খতিয়ান বুঝবার সাধ্য তোমাদের নেই,—থাকলে নিজের দেশের লোককে নরকের পথে ঠেলে দেবার জন্যে ব্যস্ত হতে না শুধুমাত্র টাকার লোভে—'

'কী উত্তর করলে ওরা?'

'উত্তর?—ঐ এককথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, শেষে ভয় দেখালে, বললে—We know how to treat patients like you! আমিও বললুম—I will see to it!'

'তোমার কি মনে হয় ওরা চরম কিছু করার ক্ষমতা রাখে?'

'একেবারে মিথ্যে আস্ফালন ওদের একথা বলতে পারিনে বৌদি। পঞ্চায়েৎ-প্রেসিডেন্ট্ থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত ওদের হাতে, কারণ

ওদের টাকা আর প্রতিপত্তির জোরেই ইলেক্‌শন্ জেতে তারা। আর পুলিশ ?—ওদের কথা ছেড়েই দাও…'

'আচ্ছা শঙ্কর, আমি একটা কথা বলছিলুম'—ব'লে বিভা একটু থামল,—'বিমল, অজিত, ওরা ফিরে আসা পর্যন্ত একাজটা বন্ধ রাখলে হত না ? বুঝতেই তো পাবো এখন শুধু আমরা ছুটিমাত্র প্রাণী এই শত্রুপুরীর মাঝখানে, যদি—'

'বিমল, প্রদীপ, দেবব্রত এরা তো এই দিন দশ-বারোর মধ্যেই এসে পড়ছে বৌদি, তার আগে একটু কাজ এগিয়ে রাখি। কাজ একবার সুরু ক'বে মাঝপথে থামলে তার ফল খুব খারাপ হয় বৌদি। তা'ছাড়া আমার আশাও হচ্ছে—অন্ততঃ জনপঞ্চাশেক লোককে বোধ হয় আমি টানতে পেরেছি কিছুটা।……তুমি তো আজ কান্ত মল্লিকের বাড়ী গিয়েছিলে, মেয়েদের কেমন মনে হল ?'

'আশা তো করছি কাজ হবে। অবশ্য সময় নেবে ঠিক। আজ প্রায় জন দশ মেয়েব সঙ্গে আলাপ হল… ।'

'ওখানেই একটা আস্তানা গাড়তে পারলে ভালো হয়, এখান থেকে রোজ যাতায়াত করতে সময় নষ্ট হচ্ছে। ভালো কথা, ইয়াসিন্ কি আজ এসেছিল বৌদি ?'

'ওঃ আমি ভুলেই গেছি বলতে। সে ছু'জন ওয়ার্কার্ নিয়ে আসবে কাল সকালে—বলে গেছে।…আচ্ছা শঙ্কর, আমরা কি সফল হব বলে তোমার মনে হয় ?'

'শুধুমাত্র ইমিডিয়েট্ সাক্‌সেস্‌টাকেই আমি বড় মনে করিনে বৌদি, ব্যর্থতার মধ্যেও অনেক সময় গভীরতর সাফল্যের বীজ নিহিত থাকে। জনমনকে ওপব-ওপর খুব বেশী উত্তেজিত কবে ক্ষণস্থায়ী সাফল্য অনেকসময় লাভ করা যায়, কিন্তু ছু'দিন না যেতে সেই উত্তেজনা আসে ঝিমিয়ে আর সেই মজ্জাগত অবসাদ এসে আবার তাকে পঙ্গু করে ফেলে। তাই আমি চাই বোঝাতে,

জাগাতে, ওদের দিয়ে অনুভব করাতে যে আমি যা বলছি তা সত্য কিনা। সেই আত্মবোধ যদি ওদের না আসে তবে তো বিপ্লব কোনোদিনই ঘটবে না ভারতবর্ষে। ওদের নেতৃত্ব যতক্ষণ না ওরা নিজেরাই করতে পারছে ততক্ষণ বিপ্লবের সুরুমাত্রও হয়নি বুঝতে হবে। আর তার জন্যে চাই শিক্ষা, সত্যিকারের জাগরণ। ওরা যদি জাগে একবার—সে শক্তি হবে অপরাজেয়। তখন পথ ওরা নিজেরাই খুঁজে নেবে, ওদের আর তখন ভাঁওতা দিয়ে কাজ গুছিয়ে নিতে পারবে না কেউই। সংগঠনী কাজে একপাও এগোতে গেলে কাজের প্রথম এবং শেষ উদ্দেশ্য বোঝা চাই।'

'শঙ্কর, তুমি খুব আশাবাদী, নয়?'

'আদর্শবাদীকে তা হতেই হবে বৌদি। তবে আমার আশাবাদ অবাস্তর স্বপ্ন-দেখা নয়, মানুষের সমস্ত ভ্রান্তি, সমস্ত দোষত্রুটি জেনেই আমি বলছি যে I believe in the inherent goodness in man and in the ultimate triumph of good—'

'অনেকে হয়তো তোমাকে ইউটোপীয়ান্ বলবে শঙ্কর—'

'আইডিয়ালিস্ট্‌কে লোকে চিরদিনই তাই বলে থাকে বৌদি। জোন্ অব্ আর্ক্ থেকে সুরু করে মার্কস্, লেনিন্, সান্ ইয়াৎ সেন্, সুভাষ বসু পর্যন্ত কেউ বাদ যায়নি। অনেক বেশী যারা আশা করতে পারে তারাই কিছুকে লাভ করে জীবনে,—যারা আশা করতে দাবী করতে ভয় পায় সেই সব কাপুরুষ পাওয়া তো দূরের কথা—যা আছে তাকেও হারায়। আইডিয়াল্ চিরদিনই দূরে—এমন কি অপ্রাপনীয়ও বলা যায়, কিন্তু তার তপস্যাই মানুষকে বড় করে। সিদ্ধি নয়, সাধনাই মানুষের হাতে, আর সেইখানেই তার সবচাইতে বড় পরীক্ষা, এবং চরিতার্থতা।'

'শঙ্কর, তোমার এই বিশ্বাস যেন আমি চরম দুঃখ-অপমানের মুহূর্তেও রাখতে পারি—'বললে বিভা।

উনিশ

শোঁ শোঁ, হুদ্দাড়্ শব্দে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল উমার। এঃ, আকাশ যে একেবারে মেঘে মেঘে ঘিরে এসেছে,—সেলাই করতে করতে অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। ঐ রাস্তার ওপারে কৃষ্ণচূড়ার গাছটা কী যে তুলছে,—সামনের ছাদে তারে টাঙানো নীল শাড়িখানা যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাতাসে।

কী যেন স্বপ্ন দেখছিল উমা, ঘুমের ঘোরে, খুব সুন্দর—খুব মধুর—এখনো তার রেশ লেগে আছে হৃদয়ে।······মনে পড়েছে, দেখছিল কে যেন—ধীরে, ধীরে—ওর মাথার কাছে এসে ওর কপালে·········কে, কে সে?—মূর্তিটা এত চেনা তবু যেন চিনি চিনি করেও চিনতে পারছিল না উমা তখন—, এখন বুঝতে পারছে, হ্যাঁ,—শঙ্কর, শঙ্করই, তাকেই দেখেছে সে স্বপ্নে। উঃ এমন জীবন্ত স্বপ্ন!—ঠিক যেন মনে হচ্ছিল সত্যি—সত্যি ঘটছে এসব।

গুরু গুরু গুরু গুরু—নিবিড় নীলকৃষ্ণ মেঘের কিনারে কিনারে সোণা আর রূপোলীর আভা। এখনি নামবে বর্ষণ·········

—মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর
নমো নম নমো নম নমো নম।
শ্রাবণমেঘে নাচে নটবর
ঝমঝম রমঝম ঝমঝম।

শিয়রে বসি চুপিচুপি চুমিলে নয়ন,
মোর বিকশিল আবেশে তনু
নীপসম, নিরুপম, মনোরম।···
কতদিনকার পুরাণো গান।

—কবি, তুমি কীভাবে যে রূপ দাও মানুষের অনুভূতিকে!

কত অনাগত যৌবনের অস্ফুট স্বপ্নমাধুরীকে ধরে দিলে ছবির সম্পূর্ণতায়। যা ছিল আভাস মানুষের অনুভবে—তা হল সত্য, চিরন্তন তোমার সঙ্গীতে..........

কিন্তু ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস!—মনে হল উমার। কবি নজরুল্‌কে একবার দেখতে গিয়েছিল সে। অন্ধকার স্যাঁৎসেতে দমবন্ধ-করা ঘরে ছিন্নশয্যায় বসে আছেন কবি—অর্থহীন দৃষ্টি,—চিরতরে বোবা, নির্বাক হয়ে গেছে একটা মানুষ, যার বজ্রনির্ঘোষে অত্যাচারীর সিংহাসন কেঁপে উঠেছিল একদিন—

আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন,
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান্‌-বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন!

... ...

বিদ্রোহী রণক্লান্ত—
আমি সেইদিন হব শান্ত...

একটা বিশ্ববিদারী চীৎকার যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে ওই দেহটার ভিতরে,—মনে হয়েছিল উমার। সে চীৎকার যদি বার হ'ত, পৃথিবী বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে যেত!

—মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর
নমো নম নমো নম নমো নম....
মোর বিকশিল আবেশে তনু
নীপসম, নিরুপম, মনোরম...

এইবার যদি শঙ্কর আসে, আর ও থাকবে না দূরে, মানবে না কোনো ভয়, লজ্জা, বলবে—'তোমাকে চাইনে, শুধু দাও আমাকে তোমার কাজের অধিকার, তোমার শক্তির মন্ত্র...।—তোমাকে পাবার জন্যেই তোমাকে ছাড়বার সাধনা আমি করব, আমাকে দীক্ষা দাও...'

কুড়ি

…'কেন তোমরা এখানে এসেছ ভাই?—যে পয়সা দিয়ে মদ খাবে তা দিয়ে কোনো খাবার খেলে তা তোমাদের বেশী কাজে লাগবে।'—ঘনায়মান সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে ভাঁটিখানার অদূরে প্রতীক্ষমান জনতার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল শঙ্কর—'বন্ধুগণ, এখুনি এই যে গিয়ে মদ খাবে তোমরা তার ফল কী হবে তা কি তোমরা জানো না? কুৎসিৎ গালাগালি, মাথা-ফাটাফাটি, অশ্লীল নাচগান—বাড়ী গিয়ে ছেলে-বউকে মারধোর—একী জীবন?—তোমবা ভাবছ তাতে কী হয়েছে! কেন ভাবছ জানো? নিজেদের ওপর তোমাদেব শ্রদ্ধা নেই। তোমরা জানো ভদ্র, সম্মানজনক জীবন—সেসব ওই বাবুদের জন্যে। আমাদের কী? আমরা যাই করি আমাদেব তো আব কেউ নিন্দে করবে না!—কিন্তু কেন এ মনোবৃত্তি? তোমরা যে পয়সা, যে সময়, যে শক্তি মদে খরচ কর তা দিয়ে কি একটু একটু করে লেখাপড়া শিখতে পারো না—ছেলেমেয়েদেবকে শেখাতে পারো না?—অন্ততঃপক্ষে ওই পয়সা দিয়ে কিছু খাবার তো কিনে খেতে পারো?—সেও মদের চেয়ে ভালো। তোমরা কি বুঝতে পারছ না এতে তোমাদের কী সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে, তোমাদের জীবনরস নিঙ্‌রে নিঙ্‌রে শুষে নিয়ে চারা দিয়ে উঠছে ওই ওপরতলার মানুষগুলো! তোমাদেরই অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তোমাদের বোকা বানিয়ে কাজ হাঁসিল করছে ওই বেনিয়ার দল, আর তোমরা তাদেরি তৈরী পথ দিয়ে ছুটে যাচ্ছ জাহান্নামের দিকে! আজ যদি তোমরা জেগে উঠে মানুষের দাবী নিয়ে চীৎকার করে ওঠ—একমুহূর্ত কি পারবে ওই রাজাসায়েবের দল টিকতে?—পারবেনা। নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারছ তোমরা নিজেরাই। ভাইসব, তোমরা এক হও, আমি

বারবার বলছি। তোমরা ওঠ, জাগো, আর কতদিন নিজেদেরকে ভুলে থাকবে, এই নরকের ঘানিটানা কি অবসান হবে না কোনোদিন? ভাইসব, তোমরা ভুলে যাচ্ছ কেন যে ভগবান্ তোমাদের জন্যে এই ধরণের জীবন সৃষ্টি করেননি—এ মানুষের তৈরী করা—তোমরা যদি একবার মাথা চারা দিয়ে ওঠ, স্বয়ং ভগবান্ তোমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন—তোমরা তাঁকে ভুলে আজ শয়তানের পায়ে মাথা বিকিয়ে দিচ্ছ তাই ভগবান্‌ও তোমাদের ভুলেছেন, কিন্তু একবার যদি তোমরা—'

'আরে আমার সাধুর বাচ্চা পীর এসেছেন আর কি!'—ভাঁটিখানার সামনে অধীর, প্রতীক্ষমান জনতার মধ্যে থেকে বলে উঠল একটা লোক—'বলে লাট্-বেলাট্ বিলিতি মদের কলসী ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছে গলায়···আরে বাবা ওসব ফন্দিতে ভোলবার ছেলে মদন মাইতি নয়। আমরা ঘুরি বিবি নিয়ে আর তোমরা চোষ ভেঁপু!—সেই সকালে তুটো পান্তা খেয়ে এসে খাটুনির চোটে ব'লে হাড় ঝাঁঝাঁ করছে আর উনি ননীর পুতুল এসে বলছেন—মদ খেও না!—এসব শয়তানী। মদ না খেলে কাল সকালে উঠে আর কাজ কত্তে হবে না! কুত্তার বাচ্চা এক কলকে কয়লা দিয়েছে কোনোদিন ফার্ণেসে?—সরে যা বলছি! পথ ছাড়্—'বলতে বলতে লোকটা এগিয়ে গেল শঙ্করের দিকে।

শির-বারকরা ডানহাতের মুঠি তার পাকানো, চোখতুটো জবাফুলের মত লাল, মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। পরনে শতচ্ছিন্ন একটা খাকী হাফ্‌প্যাণ্ট্ আর একটা ছেঁড়া, ময়লা গেঞ্জী। প্যাণ্ট্‌টা দেখলে মনে হয় পুরুষানুক্রমে ওটা ব্যবহার হয়ে আসছে।

'তুমি আগে আমার কথাটা শোনো ভাই, নইলে আমি তোমাকে যেতে দেব না'—ওর সামনে এগিয়ে গেল শঙ্কর, গভীর কণ্ঠে বলতে

লাগল—'মদে মদে তোমার দেহের কী অবস্থা হয়েছে দেখ দেখি!—তোমার স্ত্রী আজ মৃত্যুশয্যায়, তোমার বুড়ো বাপ গ্যাংগ্রীন্ ঘায়ে মরতে বসেছে, তোমার ছেলে'—

'চুপ্ চুপ্ চুপ্ শয়তান কোথাকার!'—ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত গর্জন করে উঠল লোকটা, চোখের নিমেষে ঝাঁপিয়ে পড়ল শঙ্করের উপর।

একটা হৈ-চৈ—গোলমাল—ঠেলাঠেলি—বিস্রস্ত জনতা ছুট্‌ল ওদের দিকে।

মদনের আক্রমণের প্রথম ঝোঁকটা কাটিয়ে উঠে যেই শঙ্কর নিজেকে একটু সামলে নেবার চেষ্টা করছে, অতর্কিতে একটা ভারী হাতুড়ীর প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়ল ওর মাথার পিছনদিকে। এক মুহূর্তের জন্যে ওর দেহটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পরক্ষণেই সশব্দে পড়ে গেল মাটিতে।

কী যে ঘটে গেল ব্যাপারটা নিমেষের মধ্যে—ভালো করে বুঝতেই পারল না কেউ, এমনকি মদন মাইতিও না। ওর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার পরই হঠাৎ অমন করে মাটিতে পড়ে গেল কেন শঙ্কর? ওর নাক-মুখ দিয়ে যে রক্ত বার হচ্ছে! পা-দুটো কাঁপছে থর্‌থর্ করে……একটা বেঁটে, কালো, গুণ্ডামত লোককে মদন ভিড়ের মধ্যে শঙ্করের পিছনে গুঁড়ি মেরে আসতে দেখেছিল পলকের জন্যে। সেই কি তবে…? এখন কিন্তু চারদিকে চেয়ে কোথাও তার চিহ্নমাত্রও দেখতে পেল না মদন।—বিমূঢ় মদনের চারপাশে একটা হট্টগোল উঠ্‌ল—জল! পুলিস্! ডাক্তার!…

'দিয়েছিস শেষ করে? বেশ করেছিস্! শা—লা' বলতে বলতে একজন ছুটে গেল মদনের পাশ দিয়ে। আরেক দিক থেকে উপদেশ শোনা গেল—'কী কল্লিরে ব্যাটা! পালা পালা

শিগ্‌গির, গা ঢাকা দে!' 'খুন করে ফেল্লিরে ব্যাটা একদম ঐ কাঁচা ছেলেটাকে? কী পাষণ্ড!'—মন্তব্য করলে একজন বৃদ্ধ, তার লাঠির ওপর ভর দিয়ে।

'ওকি আর এমনি করেছে—টাকা খেয়েছে—ওর ধরণ-ধারণ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম...'বলে আরো কী বলতে যাচ্ছিল পাশের লোকটি, তাকে বাধা দিয়ে একজন নেশাখোর জড়ানো-জড়ানো স্বরে বলে উঠ্‌ল—'আরে তুই কি বুঝতে পেরেছিলি? আমি ব'লে একমাস আগে বলেছিলম যে ঐ মদ্‌না ব্যাটার যা নেশার ঝোঁক ওই একদিন ওকে—'

'কেন বাজে বকছিস্ রেখো'—ওকে থামিয়ে দিয়ে ওরই একজন সহকর্মী বলে উঠ্‌ল—'মদ্‌না ওকে মেরেছে নাকি? অন্যলোকে—'

দূর থেকে বিশৃঙ্খল জনতার ভিড় ঠেলে পাগলের মত ছুটে যাচ্ছিল বিভা শঙ্করের দিকে, হঠাৎ একটা বলিষ্ঠ হাতের ধাক্কায় ধরাশায়ী করে দিল ওকে। ওর মূর্ছায়মান চেতনায় ভিড়ের মধ্যে থেকে শুধু একটা কথা শুনতে পেল—'বেবুশ্যে মাগী কোথাকার! শেষে খুনেদের হাতে ঠেলে দিলি ভদ্দনোকের ছেলেটাকে!'

একুশ

রাত শেষ হয়ে আসছে। দামোদরের জলে একমুঠো ছাই আর ফুল ভাসিয়ে দিয়ে পাষাণমূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে উমা, কালো জলস্রোতের দিকে চেয়ে—যে জলস্রোতে বয়ে নিয়ে চলেছে শঙ্করের অস্থিচূর্ণ···কোন্ দেবতার পদতলে? সামনে অবারিত কালো আকাশ যতদূর দৃষ্টি যায়—তারার মেলায় সাজানো···। নদীর ওপার থেকে রাত্রিশেষের হঠাৎ-ঘুম-ভাঙা বাতাসে দূর বনস্থলীর মর্মরিত কান্না ভেসে আসে। ঢালু হয়ে নেমে আসা ভাঙা ভাঙা পার যেখানে এসে হারিয়ে গেছে নদীগর্ভে তারই অদূরে ঠাণ্ডা, ভিজে মাটির ওপর বসে থাকে নীতা—বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সে কে—কোথায় এসেছে—কেন এসেছে—কী হয়ে গেল—ওই যে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে সামনে নিথর মূর্তির মত—ওই বা কে—কিছুই মনে নেই তার। শেষরাতের সিক্ত বাতাস বইছে নদীর কালো জলে ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ তুলে—চেয়ে চেয়ে দেখে বিভা। শঙ্করের অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব কেউ জানে না এখনো···

কিছুদূরে বসে আছে এ অঞ্চলের ক'জন কর্মী,—এদের সঙ্গে শঙ্করের পরিচয় বেশীদিনের নয়। তাদের অনুচ্চ কথাবার্তা ভেসে আসছে অন্ধকারে।—নদীর ঘাটে শুধু ওরা তিন জন। ফিরবার কথা মনে নেই ওদের। কোথায় ফিরবে? কার কাছে? ওদের তিনজনের আত্মাকে তো ওরা এ:মাত্র ছাই ক'রে ভাসিয়ে দিলো নদীর জলে······

রাত শেষ হবে। দিনের আলো ফুটবে। পৃথিবী জাগবে।—যে পৃথিবীতে শঙ্কর নেই······

চিতা যতক্ষণ জ্বলছিল, বিভার মনে হচ্ছিল এ চিতার আগুন যেন নিববে না কোনোদিন—দাউ-দাউ দাউ-দাউ দাউ-দাউ—

শঙ্করের চিতা কি নিবতে পারে? সব মিথ্যে—সত্য শুধু ওই জ্যোতির্ময় শিখা—অম্লান—অনির্বাণ···

কিন্তু নিব্‌ল। সমস্ত শ্মশান আবার ডুবে গেছে গভীর অন্ধকারে,—নির্বাপিত চিতার কাঠের রাঙা অবশেষ এখনো পড়ে আছে ওই—দুরন্ত বাতাসে নিবু নিবু হয়ে আবার জ্বলে জ্বলে উঠছে—একটু পরে ওও থাকবে না।

ভাবনা, চিন্তা, ওদের সমস্ত অস্তিত্ব খেই হারায়······।—শুধু ওই দামোদরের জল কালো নিবিড়—মৃত্যুর মত শীতল—এই দুরন্ত খ্যাপা হাওয়া—হু-হু হু-হু হু-হু—আর ওই কালো আকাশের বুকে চিরস্থির মেরুতারা············

বাইশ

সকাল থেকেই সমস্ত গোছগাছ করে ঠিক হয়েছিল নিশিকান্ত, গোবিন্দ এসে খবর দিল—'ছোটবাবু, গাড়ী তৈরী।'

'একি, এ সময় কোথা যাচ্ছিস্ নিশা ?'—কিরণময়ী হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন।

'কলকাতা যাচ্ছি মা।'

'কলকাতা !'—আশ্চর্য হয়ে গেলেন কিরণময়ী—'কই আমাকে কিছু বলিসনি তো, হঠাৎ কেন রে ?—মামলা টামলা কিছু নাকি ?—যদি তেমন কিছু হয় ওঁর পরামর্শ নিলিনে কেন ?—'

'ওসব কিছু নয় মা, এক বন্ধুর কাছে যাচ্ছি নিজের দরকারে, এই তো এখনি তোমাকে বলতেই যাচ্ছিলুম ও-ঘরে।'—

মাকে প্রণাম করল নিশিকান্ত।

'নারায়ণ ! নাবায়ণ !—পৌঁছেই চিঠি দিস্ বাবা।'

ছেলের শান্ত, শীর্ণ চেহারার দিকে চেয়ে ওর অলক্ষ্যে আঁচলে চোখ মুছলেন কিরণময়ী।

* * *

গোবিন্দকে বিদায় দিয়ে ট্রেণে উঠে বসল নিশিকান্ত। সামনে খোলা জানালা দিয়ে দেখা যায় প্ল্যাট্‌ফরমের ওপর ব্যস্ত মানুষের আনাগোনা। সিগ্‌নাল পড়ল, হুইস্‌ল্ বেজে উঠল,—কখন গাড়ী চলতে স্থুরু করেছে আনমনে টেরই পায়নি সে।

জানলা দিয়ে চেয়ে আছে নিশিকান্ত—চারপাশের দৃশ্য ক্রমেই সরে সরে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে। ওই দূরে দেখা যায় রাধানগরের শেষ প্রান্তে বুড়ো বটগাছটার তলায় সিঁদুর-মাখা পাথরের সামনে পূজোর নৈবেদ্য রাখছে গ্রামের মেয়েরা……ক্রমে রাধানগর চোখের আড়ালে চলে গেল…।

কামরায় লোক বেশী নেই। জানালার ধারে নিজেকে নিয়ে একান্তে ভাবতে বসল নিশিকান্ত। কতরকম এলোমেলো চিন্তা যে ভীড় করে আসে···

যতদিন শঙ্কর ছিল, সে এ বিষয়ে অন্ততঃ অনেকখানি নিশ্চিন্ত ছিল যে কোনো ব্যক্তিগত বিপদ-আপদে বিভার পাশে দাঁড়াতে এমন একজন আছে যে পরের জীবন রক্ষার জন্যে অকাতরে প্রাণ দিতে পারে, যার আছে বুদ্ধি, শক্তি, সাহস, এবং চরিত্র···। কিন্তু এখন, এখন তো বিভা সম্পূর্ণ একা,—নিঃসঙ্গ বাঙ্গালীর মেয়ে—এদেশের পরিবেশে সে কতখানি লড়াই করতে পারে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে?—বিভা কোথায়—কী অবস্থায় আছে—কিছুই তো জানা নেই তার। তবু নীতার কাছেই প্রথম যাবে সে···

যাকে একদিন চন্দ্রতারা সাক্ষী করে জীবনসঙ্গিনী বলে বরণ করেছিল নিশিকান্ত—তাকে সে কী দিতে পারল?—অবশ্য ভারতের পণ্ডিতেরা বলবেন স্বামীর পথই পত্নীর পথ, পত্নীর পথে স্বামী যাবে নিজের পথ ত্যাগ করে—এ ভগবান্ মনুর নির্দ্দেশ নয়। যে পত্নী সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ করে পতির পদপ্রান্তে সে প্রাতঃস্মরণীয়া পতিব্রতা। আর যে পুরুষ নারীর চরণে আত্মদান করে সে?—স্ত্রৈণ, পুরুষ-কুলকলঙ্ক!—কিন্তু মনু আর বশিষ্ঠের শাস্ত্র নিয়ে কী করবে নিশিকান্ত? যে দাম্ভিক স্বেচ্ছাচারী পুরুষ পরের আত্ম-বিক্রয়ের মূল্যে ব্যক্তিগত ভোগসুখের প্রয়াসী, সে মূঢ় কি জানবে প্রেমিকের কূলহারানো বেদনার সর্বত্যাগী বৈরাগ্য!—সে কি বুঝবে মানুষের হৃদয়ে প্রেমের স্ফুলিঙ্গ এসে যদি একবার পড়ে তবে নারীর নারীত্ব পুরুষের পুরুষত্বের অভিমান জ্ব'লে ছারখার হয়ে যায়, আগুন যদি লাগে অশোকতরু আর অর্জুনগাছ কি পৃথক্ বলে চেনা যায়?

শঙ্কর মারা গেছে। মাত্র কাল রাত্রে সংবাদটা শুনেছে সে এক

বন্ধুর কাছে—নেহাৎই অপ্রত্যাশিতভাবে। সংবাদটা এমন আকস্মিক যে বিশ্বাসই হতে চায় না।

…ছবিটা ভাসছে নিশিকান্তর চোখের ওপর। একটা তীব্র, দৃপ্ত যৌবনের ছবি……। এ ছবিব সঙ্গে মৃত্যু তো খাপ খায় না। বাববার সেই মূর্তি এসে দাঁড়ায় ওর সামনে—সেই বীরভঙ্গি—সেই সতেজ কণ্ঠস্বর…

—আমাদের বাঁচতে হবে। বাঁচবার জন্যেই আমাদেব মরতে হবে!—তাই তো। শঙ্করই যে বলেছিল। ওর জীবনমৃত্যুর রহস্য তো ও নিজেই সমাধান করে দিয়ে গেছে…

শুধু শঙ্কর নয়। ওব মত আবো যারা এসেছিল—আরো যারা আসবে অনাগত ভবিষ্যতে।—ওদের মৃত্যু নেই। ওরা হঠাৎ আসে ধূমকেতুব মত পৃথিবীব কাছাকাছি—আলোড়ন তোলে—আবার চলে যায় অনাদি অনন্ত গ্রহতাবকার পথে। Of eternity they come, to eternity they go……

তেইশ

চাঁদের কোমল আলো এসে পড়েছে বাগানের গাছের মাথায়, সামনেই শুভ্র মার্বেলের বেদীতে। বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে শশিকান্ত, মাথার কাছে বসে কিরণময়ী তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। জ্যোৎস্না-স্নাত রাত্রি, আকাশ নির্মল সুনীল। সামনে পামগাছের পিছনে চাঁদ উঠেছে—শুক্লপক্ষের চাঁদ—উজ্জ্বল তুষারকান্তি!—ফেনশুভ্র পালকের মত নরম হাল্‌কা মেঘের দল নিরন্তর ভেসে ভেসে চলেছে তার স্বর্ণাভ জ্যোতির্মণ্ডলের 'পরে ছায়া ফেলে ফেলে…।

'নিশা তো আজও এলো না!' স্বামীর চুলে আঙুল বুলোতে বুলোতে মৃদুস্বরে বললেন কিরণময়ী।

'আমার মনে হয়'—গুড়গুড়ির নলটা মুখ থেকে সরিয়ে রাখলেন শশিকান্ত—'ও বোধহয় বৌমার কাছে গেছে!—'

'বৌমার কাছে?—আমার তা বিশ্বাস হয় না!'—দৃঢ়কণ্ঠে বললেন কিরণময়ী—'সে সেরকম ছেলেই নয়। নিজের মনে তার যত দুর্বলতাই থাক, তোমার মর্যাদাহানি হবে এমন কোনো কাজ সে করতে পারে না। যে মেয়ে আমাদের এমন অপমান করেছে তার দোরে নিশা কখনোই যাবে না—যেতে পারে না—অসম্ভব!'

'কিন্তু আমার যেন কেবলই সন্দেহ হচ্ছে—নিশা আর আগের সেই নিশা নেই। ও কিছুই বলেনি আমাকে, আজকাল তো আসেই না এধার দিয়ে, কিন্তু সেদিন হঠাৎ—সেদিনটা বৃহস্পতিবার ছিল মনে হচ্ছে—হঠাৎ সন্ধ্যেবেলায় আমার ঘরে এসেছিল। আমি ওর দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম, কী যে চেহারা হয়েছে, একটা কঙ্কাল যেন—বুকের মধ্যে কী যে করে উঠল, মনে হল ও বুঝি আর বেশীদিন বাঁচবে না!'—বলতে বলতে শশিকান্তর গলা ভারী হয়ে

এল। আপনাকে সংযত করবার জন্যে একটুখানি চুপ করলেন তিনি।

—'মিনিটখানেকের জন্যে আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল। আমি ওর মুখের দিকে চাইলাম—মনে হল কী যেন বলতে চায়। আমি ওকে বসতে বললাম, ও বসল। তারপর এটা সেটা কথা পাড়লাম, যাতে ওর কথা বলা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু দুটো একটা নামমাত্র উত্তর দিয়ে ও চুপ করে রইল। কয়েকবারই আমার দিকে চোখ তুলে চাইলে, আবার নামিয়ে নিলে। কী একটা কথা ওর ঠোঁটের ডগায় এসে থমকে গেল, বলি বলি করেও বলতে পারলে না। তারপর উঠে পড়ল। আমি নিজে থেকেই বললাম—কী যেন আমাকে তুই বলতে এসেছিলি নিশা?—কিন্তু উত্তরে শুধু একবার থমকে দাঁড়ালো ও, মুহূর্তেব জন্যে আমার দিকে চোখ মেলে চাইলে—সে যে কী রিক্ততার ছায়া দেখলাম রাঙা-বৌ, তারপরেই দ্রুতপায়ে চলে গেল ঘরের বাইরে।'

'ওকে জোর করে আবার বিয়ে দিলে আর এমন হত না!' অভিযোগেব কণ্ঠে বললেন কিরণময়ী—'আমি তোমাকে তখনই বলেছিলাম ওকে নিজে ডেকে বলতে, তুমি শুনলে না! এবার আর আমি কোনো কথা শুনব না ওর, জোর করে বিয়ে দোব। ঘরের একটামাত্র ছেলে এমন করে শুকিয়ে যাবে চোখের ওপর দিনের পর দিন, একটা বংশধর না, কিছু না—এ আর আমি সইতে পারিনে! তোমার পায়ে পড়ি, দোহাই, তুমি ওকে বলো, তুমি বললে ও না বলতে পারবে না—'

'রাঙা-বৌ তুমি কি মনে কর আমি পাষাণ? আমার কি একটা সাধ নেই আহ্লাদ নেই! একটা মাত্র ছেলে—কত আশা করে যে ওকে মানুষ করেছি—সে ও-কি বুঝবে? কিন্তু যখন বুঝলাম ও আর সম্পূর্ণ আমাদের নেই,—সে আমি কেমন একরকম করে

বুঝতে পারলাম রাঙা-বৌ,—ও কিছু বলেনি, না, কোন ঔদ্ধত্য কোনো অন্যায় আঘাত ওর কাছে আমি পাইনি, মিথ্যে বলতে পারব না, কিন্তু তবু কেন জানি আমার মন—তাই আমি তোমাকে দিয়ে বলিয়েছিলুম ওকে আবার বিয়ে করতে, ও-কি জানে না সে-বলা আমারই?—তবু তো ও কোনোমতে রাজী হল না। অথচ কার জন্যে?—সেই মেয়ের জন্যে।—আচাজ্জি নিজে এসে আমাকে বললে নিশা ওদের বাড়ী বলে এসেছে সেই মেয়েই তার একমাত্র সহধর্মিনী, তাকে ছাড়া আর কোনো মেয়েকে সে স্ত্রী বলে মানতে পারবে না কোনোদিন।—যে মেয়ে আমাকে অব্ধি পায়ে দলে মাড়িয়ে চলে গেল তার প্রতি এ নিষ্ঠা কি আমাদেরই অপমান নয় রাঙা-বৌ?—যে মেয়ে স্বামী শ্বশুর শাশুড়ী কারো প্রতি শ্রদ্ধা দূরে থাক একবিন্দু মায়া পর্যন্ত রাখে না—ঘরের বার হয়ে যায় পরপুরুষের সঙ্গে···অথচ তাকে কম স্বাধীনতা আমরা দিইনি, পরীর ঘর থেকেও ফিরিয়ে এনেছিলাম, শুধু বংশমর্যাদার জন্যে রাঙা-বৌ, নইলে সে ঔদ্ধত্য কি তার ক্ষমার যোগ্য?'—একটু থেমে শশিকান্ত আবার বললেন—'এর একমাত্র শোধ হতে পারে যদি নিশা ওকে ডাইভোর্স্ করে আবার বিয়ে করে, ও মেয়ের মুখ আর এ জন্মে না দেখে!'

'তাই হবে, দেখো, আমি বলছি তাই হবে। এবার ওর বিয়ে আমি দোবই, আমার রাধাবল্লভজীর নামে শপথ করছি, নয়তো এ-সংসার ছাড়ব!'

'কিন্তু ওকে কি কোর্টে দাঁড় করানো যাবে?'—সন্দিগ্ধকণ্ঠে বললেন শশিকান্ত।

'যাবে।'—সমস্ত সংশয়কে জোর করে ঠেলে রেখে কিরণময়ী বললেন—'ওকে বুঝিয়ে বলব সব কিছু, এ-বংশের মর্যাদার কথা, ওর অবস্থা তোমার সম্মান, বলব আমাদের ক্ষোভের কথা, কতখানি লজ্জা আমাদের পক্ষে ওই মেয়েকে শিক্ষা না দেওয়া—'

'সত্যি আমি তো ভেবে পাইনে কী-করে এ অপমান হজম করে নিল ও। শুধু তাই নয়—আবার ওই মেয়েরই দ্বারস্থ হওয়া...'—ক্ষোভে, ক্রোধে, ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠল শশিকান্তর মুখ।

'আমি কালই চিঠি লিখব ওকে, নায়েবমশায়ের হাতে পাঠাব,—নীতার ওখানেই থাক্ কি যেখানেই থাক্ ও ঠিক খুঁজে বার করবে। আর একমুহূর্ত দেরী নয় ওকে বাঁধতেই হবে!'

'এই আমার শেষ চেষ্টা, রাঙা-বৌ, হারি কিংবা জিতি। আমি ওর সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করব। সমস্ত ঘরে-বাইরে এমন কলঙ্ক মেখে আর এখানে থাকা অসম্ভব রাঙা-বৌ, যেখানে একদিন আভিজাত্য আর কৌলীন্যে আমাদের তুলনা ছিল না, সেখানে আজ আমার ছেলেকে দেখে গ্রাম-গ্রামান্তরের লোক হাসি-টিটকিরি দিচ্ছে—এমন ভিখিরীর চেহারা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও।—এর চেয়ে যদি ও একদল রক্ষিতা রেখে আমোদ-আহ্লাদ করত সেও হাজার গুণে ভালো ছিল, তাতেও আভিজাত্য আছে! যার তেজ নেই প্রতাপ নেই সে যে ছাগলেরও অধম রাঙা-বৌ! ও যদি ও-মেয়েকে হত্যা করে ফাঁসি যেত আমি ওকে পুরুষ বলতাম—'

স্বামীর কথা শুনতে শুনতে আগুন জ্বলে উঠল কিরণময়ীর অন্তরে, মনে মনে একটা কঠোর শপথ করলেন তিনি।

চব্বিশ

সন্ধ্যাবেলা। নিজের ঘরে দুয়ার বন্ধ করে একখানা চিঠি পড়ছিল নীতা।

'প্রীতিভাজনাসু,

যেখানে যে পরিবেশে বসে এ-চিঠি লিখছি তা আমি এর আগে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি।—এক পাহাড়ী পরিবারের গৃহে আমি আশ্রয় নিয়েছি, জায়গাটার নাম··· থাক্। আমি এদের ভাষা বুঝিনে, তবে এরা দুয়েকটা ইংরিজী কথা জানে, বাকীটা ইসারা-ইঙ্গিতে চালাই। আর বেশী কথা বলার দরকারও হয় না, সেই একটা সুবিধে। এখন রাত দশটা। বাইরে বরফ পড়ছে অবিশ্রাম—শোঁ শোঁ ঝর্‌ঝর্ বাতাসের গোঙানি চলেছে, কাঠের ঘরের বাইরে এসে অবিরত আঘাত করছে তুষারের তীর। একটা ল্যাম্প্ (আমার সঙ্গে সবসময় থাকে এটা) জ্বেলে লিখছি,—বড় ঠাণ্ডা, পাহাড়ী কম্বল নিয়েছি তবু···। খাওয়া হয়ে গেছে অনেক্ষণ, ওরা বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছে পাশের ঘরে। এঘরটা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে খাতির করে,—এরা জানে আমি ভারতীয় সন্ন্যাসিনী—গায়ে আমার গেরুয়া···। এখানে কয়েকজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং ভারতীয় পরিব্রাজকের সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছে আমার। সামনে এখনও দীর্ঘ পথ······

যে আশা নিয়ে চলেছি—দুরাশাই তাকে বলা যায়। বলতে গেলে অন্ধকারের মধ্যে চলেছি হাত্‌ড়ে হাতড়ে। কিন্তু তবু বুকে আমার অসীম আশা আর দুর্বার প্রতিজ্ঞা। I will try to the last! সঙ্গে আছে একটা বাইবেল্, একটা ছোট্ট গীতা, লাইফ্ অব্ লেনিন, আর দি চায়নীজ্ স্ট্রাগ্‌ল্—এই ক'টা বই থেকে আমি প্রতিদিন শক্তি সঞ্চয় করি···। এখানে আসবার ক'দিন আগে

ছোট্টুলালের কাছে খবর পেলাম ডুয়ার্স্, ব্যাঙ্গালোর্ আর আলিগড়ে কাজ ভালোই এগোচ্ছে।

উমাকে বোলো তাকে যেটুকু নির্দেশ দিয়েছি সেইমত কাজ করলেই তার কর্তব্য করা হবে। সকলের কাজ তো এক নয়। পথও এক নয়। যদিও শেষ লক্ষ্য এক।

যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন শঙ্কর দেখে গেছে, তাকে সার্থক করে তুলতে হবে। এ-ছাড়া আর কোন কামনা আজ আমাদের নেই। জানি সে কাজ সহজ নয়। হয়তো একটা জেনারেশনই প্রতীক্ষা করতে হবে। হয়তো সে ভারতবর্ষ আমরা দেখতে পাব না। কিন্তু একটা যুগের মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করে, তবেই পরের যুগের মানুষের পায়ের তলার মাটি তৈরী হয়। যে-দুটো দেশ আজ নতুন করে বেঁচে উঠেছে তাদের ইতিহাস খুলে দেখ! আজকের দধীচিদের অস্থি দিয়ে যে বজ্র তৈরী হবে তারই বলে মহাশক্তির অধিকারী হবে কালকের ভারতবর্ষ, সে শক্তি অমোঘ, নির্মম।

একজনের কথা আজ কেন জানি বড় মনে পড়ছে। হয়তো এ-জীবনে তাঁর সঙ্গে আর দেখাই হবে না…। কিন্তু—'দাস যারা তারা তো পারে না ভালোবাসতে…'—কোরিয়ার সেই নাম-না-জানা কবির গান মনে পড়ে—'তাই দাসত্বের শৃঙ্খল মোচন করব আমরা। আমরা হব মুক্ত, আমরা ভালোবাসব!' —আমরা হব মুক্ত, আমরা ভালোবাসব…কিন্তু সে কবে?

তুমি আমার একান্ত অন্তরঙ্গ, তাই তোমার কাছে একটি অনুরোধ রেখে যাচ্ছি। তোমার নিশিদার সঙ্গে যদি কখনো তোমার দেখা হয় তবে তাঁকে বোলো আমায় তিনি যতখানি নিষ্ঠুর বলে জেনেছেন ততখানি নিষ্ঠুর বোধ হয় আমি ছিলাম না, আর…তিনি যেন আমায় ক্ষমা করেন…

চিরদিনের জন্তে তোমার পথে আমার কল্যাণেচ্ছা রইল।

ইতি—

তোমার বৌদি'

পঁচিশ

শান্ত, স্তব্ধ দুপুর। মাদুরে শায়িত কিরণময়ীর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে বিন্দু। আজ সরকারকে ডেকে শশিকান্ত বিশেষ পরামর্শ করবেন নিশিকান্তর বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যাপারে, সেই কথাই ভাবছিলেন কিরণময়ী।

'মা, আজকের চিঠি।'—তাঁর সামনে একগোছা চিঠি এনে নামিয়ে দিল নতুন ঝি।

নানারকম চিঠি—নানালোকের। এই চিঠি-দেখার কাজ আগে ছিল শশিকান্তর, আজকাল নিশিকান্ত দেখত। নিশিকান্তর অনুপস্থিতিতে চিঠির তাড়া ইদানীং কিরণময়ীর কাছেই আসে, কারণ শশিকান্ত আর এসব কাজ করতে চান না এখন। তাঁর চিঠিগুলো দেখে নিতান্ত প্রয়োজনীয়গুলিই শুধু তাঁকে পড়তে দেন কিরণময়ী।

বিচিত্র সব চিঠি, বিচিত্র মানুষের। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, কর্মচারী, পাণ্ডা-পুরোহিত, এ গ্রামের সেগ্রামের কত পরিচিত অপরিচিত আবেদনকারীর চিঠি! —মামলা টামলার ব্যাপারও বাদ নেই ওর মধ্যে। চিঠিগুলো একের পর এক তুলতে তুলতে নিজের বাঞ্ছিত চিঠিখানা পেয়ে গেলেন কিরণময়ী। নিশিকান্তর চিঠি—তাঁর পত্রের উত্তর। খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা পড়তে লাগলেন তিনি :—

মা,

আজ আমার বুকের কথা তুমি যদি না বোঝো, আর কেউ বুঝবে না। মা, তোমরা আমায় মুক্তি দাও, এই সমাজ-সংসারের বোঝা আর আমি বইতে পারছিনে! বিশ্বাস কর, আমার শক্তির শেষ সীমা পর্যন্ত আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারলাম না। আমায়

তোমরা ক্ষমা কর একথা আমি আজ আর বলব না। সন্তান হয়ে আমি তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারলাম না, তোমাদের সুখী করতে পারলাম না, এ যে আমার কী বেদনা সে শুধু অন্তর্যামী জানেন। আমি তোমাদের অযোগ্য সন্তান, তাই সন্তানের অধিকার আমি চাইনে। তোমাদের আদেশ, তোমাদের সম্মান, তোমাদের বংশমর্যাদা রক্ষা করবার যোগ্য উত্তরাধিকারী আমি নই—সত্য বলছি, অভিমান করে বলছিনে। তাই আমার একটি প্রস্তাব, যদি তুমি ব্যথা না পাও, তোমরা দত্তকপুত্র গ্রহণ কর—যে তোমাদের সন্তানের দায়িত্ব যথার্থ পালন করতে পারবে। তোমাদের সমস্ত সম্পত্তি, তোমাদের সমস্ত কিছুর অধিকার তাকে দিও।

মা, শঙ্কর আজ মৃত। বিভা কোথায় জানিনে। নীতাও তার সঠিক কোনো সন্ধান দিতে পারলে না। কিন্তু তাকে আমার খুঁজে বার করতেই হবে। আমি তোমাকে বরাবরই বলেছি, আজও বলছি, সে মহীয়সী, তাকে ত্যাগ করা আমার কল্পনার অতীত। আমি নিজেকে ত্যাগ করতে পারি, এ পৃথিবীতে আমার যা কিছু কাম্য সমস্ত বিসর্জন দিতে পারি এক মুহূর্তে, কিন্তু তাকে ত্যাগ করতে পারিনে।...

ঈশ্বরের স্পর্শ আমরা সাধারণ মানুষ পাইনে, কিন্তু শুনেছি যেখানে সত্য যেখানে সুন্দর সেখানে তাঁর আসন। তাই তাঁর কাছে নিজে যদি না যেতে পারি, যে তাঁর কাছাকাছি আছে তার কাছে যেন যেতে পারি...। এতদিন আমি মূঢ় অন্ধ ছিলাম মা! আজ শঙ্করের মৃত্যু—বিভার এই জীবন—আমার সমস্ত সত্তাকে ভূমিকম্পের মত ওলট্-পালট্ করে দিয়েছে। মা, আমরা সাধারণ মানুষ অনেক সময়েই কাছের মানুষকে চিনতে পারিনে, জানিনে তার মূল্য দিতে। শঙ্করের জীবনটা ভাবতে গিয়ে আজ মৃত্যুর

অন্ধকার ভেদ করে ওর যে জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখছি আমার দৃষ্টির সামনে সে তো এতদিন দেখতে পাইনি! তাকে একদিন আমি উপহাস করতাম, সে যে আমারই হৃদয়ের কতখানি দীনতা আজ তো নিঃসংশয়ে বুঝেছি...

মা, প্রচণ্ড দুঃখের মাঝেও আজ অন্তত: এই উপলব্ধিটুকু আমি লাভ করেছি যে অসত্যের সঙ্গে আপোষ—যাকে আমরা সাধারণ মানুষ পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ মনে করি—মানুষকে ধ্বংসের পথেই নিয়ে চলে। জীবন মানে তো শুধু পশুর মত খাওয়া, ঘুমোনো, আর সন্তান প্রসব করা নয় মা...। জীবন মানে ব্যাপ্তি—জীবন মানে বহুর মধ্যে আপনাকে অনুভব করা—জীবন মানে ক্ষুদ্র হতে বিরাটতর সত্যের মাঝে নিরন্তর এগিয়ে চলা...।

আজ হয়তো এই মুহূর্তে তোমরা আমায় বুঝতে পারবে না। হয়তো একটা প্রচণ্ড আঘাত পাবে। তবু আমি জানি একদিন তোমরা আমাকে বুঝবেই বুঝবে। মা, একথা যদি সত্য হয় যে তোমরা কোনোদিন আমাকে ভালোবেসেছিলে, তবে সমস্ত ভুল-বোঝার অন্ধকার ভেদ করে সত্য একদিন তোমাদের চোখে ধরা পড়বেই পড়বে।

তোমাদের আমি ভালোবাসি কি না সেকথা আজ আর তুলব না। তার শেষ বিচার তোমাদেরই হাতে রইল। কিন্তু সমস্ত রকম প্রবঞ্চনার বোঝা থেকে মুক্তি যেন আমার হয়, আর যেন নিজের কাছে পরের কাছে অভিনয় করে না চলি—শুধু সেই আশীর্বাদটুকু কোরো ·

নীতার ঠিকানা দিলাম নীচে, যখনি তোমাদের কোনো প্রয়োজন হবে, আমায় লিখো। আমি তখনি চলে আসব।

অনন্তকোটি প্রণাম আর আমার অশেষ ভালোবাসা রইল

তোমাদের পায়ে। মা, আর সবাই আমার হৃদয়ের অর্ঘ্য ফিরিয়ে দিলেও তুমি তো পারবে না জানি…

ইতি—

তোমারই

নিশা

তীরবিদ্ধ পাখীর মত ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন কিরণময়ী। নিশিকান্ত লিখেছে, যদি কোনো প্রয়োজন হয়, সে আসবে তাঁদের কাছে। কোন্ প্রয়োজনের কথা বলতে চায় নিশিকান্ত? তাঁদের অসুখ-বিসুখ, আপদ্-বিপদ্?—তাতে নিশিকান্তকে কী দরকার? তাঁদের নিজেদের জীবনের কী অর্থ আর আছে তাঁদের কাছে?—দত্তকপুত্রের কথা কী করে তুলতে পারল নিশিকান্ত? তাঁদের যা কিছু আশা আশঙ্কা আনন্দ—সে তো ওকেই ঘিরে। এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারল না তাঁর পেটের সন্তান?

……ওর তো সন্তান নেই। কী করে বুঝবে জননীর অন্তর্বেদনা পিতার পিতৃত্বের অভিমান কত গভীর?………… যার জন্মমুহূর্ত থেকে তার জীবন-মরণ হাসি-অশ্রুর মধ্যে নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছেন, সে আজ তাঁকে ত্যাগ করতে পারল,—এতো সহজে, এমন অবলীলায়?

ছাব্বিশ

শেষরাত্রির শিশির ঝরছে বাগানে হরপার্বতীর রঙীন পাপড়ির দলে, সবুজ ঘাস আর নরম মাটির বুকে। দূর দিগন্তে ক্ষীণ পাণ্ডুর অস্তচন্দ্রের সোনালী আভা ছড়িয়ে আছে আশে পাশে, অবসন্ন রজনীর প্রান্তদেশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। পাতাবাহার আর পামগাছের সারি যেখানে ঘন সেখানে এখনো অন্ধকার জড়িয়ে আছে, মাঝে মাঝে ডালপালা কাঁপিয়ে বয়ে যাচ্ছে রাত্রিশেষের হিমেল বাতাস।

নিজের শয়নকক্ষের দুয়ারের পাশে বসে কিরণময়ীর সারারাত কেটে গেল। চেষ্টা করলেও উঠতে পারছেন না তিনি এখান থেকে, যেন বিকল অবশ হয়ে গেছে তাঁর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। চোখের পাতা খোলা—স্থির নির্নিমেষ, বুজবে না কোনোমতেই।

শর্বরী শেষ হয়ে আসে, দিগন্তভালে জ্বলজ্বল করে শুকতারা। শান্ত নীল আকাশ এমন স্বচ্ছ সুন্দর, মনে হয় ধূলিমালিন্যের স্পর্শমাত্র নেই কোথাও,—নিশান্তের হিমজ্যোতিতে স্নান করে কী অপরূপ যে দেখায়! অপলক চোখে চেয়ে থাকেন তন্দ্রাহীন কিরণময়ী।

'রাঙা-বৌ!' —চমকে চেয়ে দেখেন শশিকান্ত কখন এসে দাঁড়িয়েছেন পাশে। কোনো কথা যোগায় না তাঁর মুখে, শুধু অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন শশিকান্তর মুখের দিকে—সে মুখে এক গভীর নির্লিপ্তি, এক অখণ্ড শান্তির দীপ্তি।

'আমি সারারাত মন্দিরে ছিলাম!'—নিজে থেকেই বলতে লাগলেন শশিকান্ত—'ভাবতে ভাবতে, ভাবতে ভাবতে—হঠাৎ একটা গভীর মুক্তি পেয়ে গেলাম। মনে হল নিশাকে যদি সত্যিই ভালোবেসে থাকি তবে এ আত্মাভিমান কেন?—তার জন্যে তো

সর্বস্ব—আমার আমিকেও ত্যাগ করতে পারি অনায়াসে—একমুহূর্তে। রাঙাবৌ, কাল রাতেও আমি এই কথা কেবলই ভেবেছি, নিশা কী এমন পেল হঠাৎ তার মনের মধ্যে যাতে সে এমন করে সমস্ত সমাজ সংসারের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল?—অসহ্য যন্ত্রণাবোধ হচ্ছিল তখন,—কিন্তু আজ এইমুহূর্তে আমি তাকে যেন কিছুটা বুঝতে পারছি। সমস্ত অভিমান জ্বালাযন্ত্রণাব পারে আত্মনিবেদন—কিছুই বাকী না বেখে নিঃশেষে আত্মদান। ওর মত ওর পথের সঙ্গে আমার পথ মিলবেনা সত্য, কিন্তু তবু আমি ওকে আজ ক্ষমা করতে পাবলাম—শুধু এইজন্যে। মনে হল ঠাকুর নিজেই আমার অন্তরে এসে এইকথা বুঝিয়ে দিলেন।......এইমাত্র আমি মন্দিরে ভগবানের কাছে শপথ করে এলাম আব আমি ভাগ্যেব সঙ্গে লড়াই করব না। নিশাকে আমি ক্ষমা কবেছি। ওকে আমার সমস্ত আমি দিয়ে গেলাম, যিনি অন্তর্যামী সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্ণধার তাঁব হাতে ওকে আজ সঁপে দিয়েছি। আমার সমস্ত পবাজয়ের বেদনার পারে আজ এই সত্য এই শান্তিটুকু আমি লাভ করেছি যে সমস্ত পথই শেষ গিয়ে ঠেকেছে তাঁরই চরণতলে, তুমি আমি স্রোতের তৃণ বইতো নয়। ......আমি যেন বেশ বুঝতে পারছি এ তাঁরই ডাক, প্রচণ্ড আঘাতের বেদনার মধ্যে দিয়ে এমনি করেই তো তাঁর ডাক আসে রাঙাবৌ, তাকে অবহেলা করবার সাধ্য আমাদের নেই।—চল আমরা হৃষীকেশে যাই।'

সমাপ্তি